ইউনিট ৬: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে শিক্ষা পরিকল্পনা ও বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশ

ভূমিকা

বাংলাদেশে শিক্ষার যে পরিকল্পনা বর্তমানে প্রণীত হয়ে থাকে তা সাধারণত জাতীয় পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই প্রণীত হয়ে থাকে। কিছুদিন আগেও শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি উর্ধ্ব থেকে নিম্নগামী (Top-down) ছিল। বর্তমানে তা পরিবর্তিত হয়ে বহুলাংশে নিম্ন থেকে উর্ধ্বগামী (Down-up) হয়েছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে মেয়াদ ভিত্তিতে দ্বিবার্ষিকসহ সাতটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। বর্তমানের শিক্ষা পরিকল্পনার সবলতা এবং দুর্বলতা দুটোই রয়েছে। আজকের শিক্ষা ও এর পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোকপাত করার পূর্বে এর ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে জানা প্রয়োজন।

এ ইউনিটে শিক্ষা পরিকল্পনাকে ৬টি পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে। এই পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ ৬.১:	বৃটিশ পূর্ব বাংলাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনা
পাঠ ৬.২:	বৃটিশ শাসনামলে বাংলাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনা
পাঠ ৬.৩:	পাকিস্তান শাসনামলে বাংলাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনা
পাঠ ৬.৪:	স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা পরিকল্পনা (১৯৭২-১৯৭৮) ও কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ
পাঠ ৬.৫:	শিক্ষা পরিকল্পনা ও শামসুল হক শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট
পাঠ ৬.৬:	শিক্ষা পরিকল্পনা ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

পাঠ ৬.১ : বৃটিশ পূর্ব বাংলাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বৃটিশ পূর্ব দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা এবং এ সম্পর্কে এ্যাডামের রিপোর্ট ও পরিকল্পনা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, ১৮১৩ সালের সনদ ও মিশনারীদের শিক্ষা পরিকল্পনা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতি ও উডের ডেসপ্যাচে বর্ণিত শিক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন।

আর্য যুগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে এক ধরনের দেশীয় শিক্ষা গড়ে উঠে। এ শিক্ষা বিস্তারে কোন রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলার মানুষ, দানশীল, বিদ্যোৎসাহী এবং সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ শিক্ষার উন্নয়ন ও বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। স্থানীয় ব্যক্তিগত এবং বেসরকারী উদ্যোগে ক্রমান্বয়ে তিন ধরনের বিদ্যালয় গড়ে উঠে। যেমন-

১. **পরিষদ-** প্রধানত ব্রাহ্মণ প্রবীণদের সংস্থা।
২. **টোল-** সংস্কৃত শিক্ষার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যা ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।
৩. **পাঠশালা-** অস্পৃশ্য এবং দেশের আদিম অধিবাসী ব্যতীত অন্যান্য সকলের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়।

দেশীয় বিদ্যালয়গুলো প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে বিভক্ত ছিল। মক্তব ও পাঠশালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং টোল (হিন্দুদের) ও মাদ্‌রাসা (মুসলমানদের) উচ্চ বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দেশীয় শিক্ষা পরিকল্পনা

১. বৃটিশ পূর্ব ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের দেশীয় শিক্ষা কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে গড়ে উঠেনি।
২. দেশীয় শিক্ষা মূলত বেসরকারী উদ্যোগে (অর্থায়ন, জমিদান, বিনা বেতনে ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষাদান) স্বল্প ব্যয়ে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে গড়ে উঠে।
৩. দেশীয় শিক্ষার উন্নয়নে “পড়ো সর্দার” প্রথা একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল। সঠিক পরিকল্পনা এবং দূরদৃষ্টির অভাবে এদেশে তা যথার্থ ফলাফল আনয়নে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে “বেল পদ্ধতি” নামে অভিহিত হয়ে ইংল্যান্ডে এ প্রথা শিক্ষার ব্যাপক উন্নয়ন ও অগ্রসরতায় অবদান রাখে।
৪. দেশীয় শিক্ষা সাধারণত দেশীয় শিক্ষাবিদ ও বিদ্যোৎসাহীদের দ্বারা পরিকল্পিত ও পরিচালিত হতো। প্রয়োজনীয় সাহায্য উৎসাহ ও পরিকল্পনার অভাবে তা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠেনি।
৫. দেশীয় শিক্ষা মূলত ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য ব্যতীত ব্যাপক গণমানুষকে সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর না হওয়ায় এর ভিত্তি দুর্বল থেকে যায়।

দেশীয় শিক্ষা এ্যাডামের রিপোর্ট ও শিক্ষা পরিকল্পনা

মিশনারী ধর্ম প্রচারক উইলিয়াম এ্যাডাম ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড বেন্টিংক এর নির্দেশে দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে তিনটি রিপোর্ট পেশ করেন। এতে বাংলা ও বিহারে এক লক্ষ বিদ্যালয় ছিল বলে উল্লেখ করা হয়। এ্যাডামের রিপোর্টে দেখা যায় যে, বাংলা বিহার প্রদেশের মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, দক্ষিণ বিহার, ত্রিহুত এ পাঁচটি জেলায় শিক্ষিত লোকের হার ছিল ৬.১%। এ্যাডামের রিপোর্টকে কোন কোন বিশেষজ্ঞ (যেমন- স্যার ফিলিপ হার্টগ) অতিরঞ্জনের দোষে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। অনেকে (যেমন- আর ভি পেরুলেকার) এটাকে সঠিক বলেছেন। তবে পারিবারিক শিক্ষা, বিদ্যালয়, মক্তব, মাদ্‌রাসা, টোল প্রভৃতিকে বিবেচনায় রাখলে এ্যাডামের রিপোর্টের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। এ্যাডাম রিপোর্টের মূল সাফল্য হলো যে, তখনকার দেশীয় শিক্ষার একটা গতি-প্রকৃতি তিনি চিহ্নিত করতে পেরেছেন। প্রয়োজনীয় সংস্কার, উৎসাহ, সাহায্য

এবং পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ভবিষ্যৎ সুপরিকল্পিত শিক্ষার একটা বুনিয়াদ হিসেবে সৃষ্টি হতে পারতো বলে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছে ছিলেন। এসকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেশীয় শিক্ষা উন্নয়নের জন্য কতগুলো সুপারিশ পেশ করেন।এটাকেই এ্যাডামের শিক্ষা পরিকল্পনা বলা হয়।

এ্যাডামের শিক্ষা পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলো হল:

১. কোন জেলা বা জেলা সমষ্টিকে নির্বাচন করে পরীক্ষামূলকভাবে শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
২. ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবহারোপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে।
৩. এজন্য জেলাগুলোতে প্রয়োজনীয় জরিপ কার্য পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
৪. জরিপকার্য তদারক, পাঠ্যপুস্তকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও কৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করার জন্য জেলাসমূহে একজন পরীক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।
৫. পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষকদের লব্ধ জ্ঞানের সম্পর্কিত করে পুরস্কৃত করার সুপারিশ পেশ করা হয়।
৬. দেশীয় বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়।
৭. শিক্ষকদিগকে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতা করার অনুপ্রেরণা দানের জন্য গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণ জমি দানের জন্য তিনি সুপারিশ করেন। শিক্ষার উন্নয়নে এ্যাডামের পরিকল্পনার যৌক্তিকতা থাকা সত্ত্বেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী

রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬৫ সালে আত্মপ্রকাশ করে। ক্ষমতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত কোম্পানী এদেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মিশনারীদের ধর্ম প্রচার ও খৃষ্টানদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সাহায্য করে আসছিল। ১৮১৩ সালে কোম্পানী সনদ আইনের মাধ্যমে ভারতের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। তথাপি ১৮১৩ সালের সনদ আইনকে ভারতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার সন্ধিকাল (Turning Point) বলা হয়। এক লক্ষ টাকা বরাদ্দের উদ্দেশ্য ছিল: (১) ভারতীয় সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নয়ন; (২) পন্ডিতবর্গকে উৎসাহ দান এবং (৩) জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নয়ন সাধন। কিন্তু উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা না থাকায় নিম্নের চারটি বিষয়ে ব্যাপক মতবিরোধ সৃষ্টি হয়।

১। **শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ:** ভারতবর্ষের লোকদের শিক্ষিত করা, নাকি পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তার করা অথবা কোম্পানীর অধীনে নিম্নের পদগুলোতে নিয়োগ পাওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ভারতীয় শিক্ষিত জনগণ সৃষ্টি করা, এসব প্রশ্নে বিতর্ক সৃষ্টি হয়।

২। **শিক্ষায়তনগুলোর পরিকল্পনার দায়িত্ব:** একদল শিক্ষাবিদের মতে ভারতীয় জনগণের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই থাকবে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বে। অন্যদের মতে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবে এবং কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়গুলো চলবে।

৩। **শিক্ষা বিস্তার পদ্ধতি:** এতে নানা ধরনের মতামত পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে বিপরীত ধরনের দু'টি মতামত দেখা যায়। তা হল:

ক. কোম্পানী কিছু সংখ্যক ভারতীয়কে শিক্ষিত করবে এবং এসকল শিক্ষিত ব্যক্তি সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করবে। এরা শিক্ষায় নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতির (Theory of Downward Filtration in Education) প্রবক্তা।

খ. কোম্পানী মুষ্টিমেয় ভারতীয় মানুষকে নয় বরং সমগ্র ভারতবর্ষের জনসাধারণকে শিক্ষাদানের উপর গুরুত্বদান করবে।

৪। **শিক্ষার মাধ্যম:** একদল শিক্ষাবিদ দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপর গুরুত্বারোপ করেন। অপর পক্ষ আরবী ও সংস্কৃতি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণের সুপারিশ করেন। তৃতীয় পক্ষ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

এসব মত পার্থক্য সত্ত্বেও সনদ আইন কমিটি শিক্ষা পরিকল্পনায় যা সংযোজন করে তা হল:

১. কলিকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস সংস্কৃতি কলেজের পুনর্গঠন;
২. ১৮২৪ সালে কলিকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন;

৩. আগ্রা ও দিল্লীতে দু'টি প্রাচ্য শিক্ষার কলেজ স্থাপন;
৪. আরবী ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুস্তকসমূহের প্রকাশনা ও মুদ্রণের ব্যবস্থা করা;
৫. ইংরেজি ভাষায় রচিত জ্ঞান বিজ্ঞানের পুস্তকসমূহ প্রাচ্য ভাষায় অনুবাদ করা।

মিশনারীদের শিক্ষা পরিকল্পনা

ভারতীয় উপমহাদেশে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমা ইংরেজসহ নানা ধরনের মিশনারীর আগমন ঘটে। মিশনারীদের মূললক্ষ্য ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে নিজ নিজ ধর্ম প্রচার করা। কিন্তু মিশনারীদের কাজকর্ম ধর্ম প্রচার ছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে বিস্তৃতি লাভ করে। শিক্ষা সম্পর্কিত মিশনারীদের ক্রিয়াকর্ম কোন সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে সংগঠিত হয়নি। তা সত্ত্বেও শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের অবদানকে ক্ষুদ্রভাবে সম্পর্কিত করার কোন অবকাশ নেই। ভারতে মিশনারীদের শিক্ষা সম্পর্কিত কাজগুলো হল:

১. পর্তুগীজ মিশনারীদের দ্বারা স্থাপিত প্রাথমিক ল্যাটিন বিদ্যালয়, অনাথ বালক বালিকাদের জন্য স্থাপিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, জেসুইট কলেজ, ছাপাখানা ইত্যাদি স্থাপন।
২. দিনেমা মিশনারীরা ভারতের ত্রিবাঙ্কুরে ও কোলকাতায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তন্মধ্যে ত্রিবাঙ্কুরে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ও দুটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপন, তামিল ভাষার ব্যাকরণ রচনা এবং আরো বিভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠা করে।
৩. ফরাসী মিশনারীরা ভারতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র, পুস্তক বিতরণের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।
৪. ইংরেজ মিশনারীরা কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তারা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারেসচেষ্ট ছিল। ইংরেজ মিশনারীদের প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুরে ২০টির অধিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।
৫. ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত মিশনারীরা ভারতে ১৬২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬৪,০৪৩ জন। একই সময়কালে বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৪৭৪ এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬৭,৫৬৯ জন। তাই এদেশের শিক্ষা পরিকল্পনা ও উন্নয়নে মিশনারীদের প্রচেষ্টাকে গুরুত্ব সহকাওে বিবেচনা করতে হবে।

নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতি

১৮১৩ সালে সনদ আইনের মাধ্যমে ভারতের জনগণের শিক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত এক লক্ষ টাকা কিভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে এ সম্পর্কে লর্ড মেকলের প্রদত্ত মতামতই "নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতি" নামে অভিহিত। এতে ভারতীয় সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার কথা বলা হয়েছে। এদের প্রাপ্ত শিক্ষা চুইয়ে নেমে কালক্রমে অন্যান্য মানুষকেও শিক্ষিত করবে। মেকলের মতে "এমন এক শ্রেণির লোক গড়তে হবে যারা আমাদের দোভাষীর কাজ করবে। তারা হবে এমন এক শ্রেণির লোক যারা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, নীতি ও বুদ্ধিতে ইংরেজ"। নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতি দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ধ্বংস ডেকে এনেছিল। এতে দেশীয় ভাষা, সাহিত্য, প্রাথমিক বিদ্যালয় শক্তিহীন হয়ে পড়ে। এ নীতি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে পরিকল্পিত হয়নি। তাই এর বিকাশ ঘটেছে খামখেয়ালী ও এলোমেলোভাবে।

উডের ডেসপ্যাচ

১৮৫৪ সালে চার্লস উড শিক্ষা ডেসপ্যাচ প্রণয়ন করেন। ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত একটা সুবিন্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব এতে করা হয়। এতে ভারত এবং ইংল্যান্ড উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষার প্রস্তাব করা হয়েছে। ডেসপ্যাচে ভারতীয়দের শিক্ষিত করার, ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণের স্বীকৃতি দেয়া হয়। ডেসপ্যাচের শিক্ষা পরিকল্পনা নিম্নরূপ:

১. বাংলাসহ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষা বিষয়ক উন্নয়নের জন্য জনশিক্ষা বিভাগ গঠন করা।

২. পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রি প্রদানের জন্য লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা।

৩. দেশের সর্বত্র প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার নীতি ঘোষণা করা হয়। স্কুল ও কলেজে মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করা হয়। চালর্স উড এভাবে তথাকথিত “নিম্নগামী পরিস্রবণ তত্ত্বের” ক্ষতিকারক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে সর্বস্তরের জনগণের শিক্ষার জন্য সরকারী অর্থব্যয়ের নীতি ঘোষণা করেন।

৪. সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী শিক্ষা উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শর্তসাপেক্ষে সরকারী অনুদান বা গ্রান্ট-ইন-এইড দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়।

৫. সকল পর্যায়ের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব পেশ করা হয়।

৬. বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সংকল্প ব্যক্ত করা হয়।

৭. শিক্ষাক্ষেত্রে পাশ্চাৎপদ মুসলিম ও নারী সমাজকে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়।

৮. ভারতবাসীর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা সরকারের পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়।

৯. শিক্ষার জন্য সরকারী কোষাগার ছাড়াও বাড়তি আয়ের উৎস হিসেবে মিউনিসিপ্যালিটি, ছাত্রবেতন এবং দানশীল দেশবাসীদের চিহ্নিত করা হয়।

ডেসপ্যাচের শিক্ষা সংক্রান্ত অনেক নীতিই কার্যকর হয়নি। ব্যয় বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকার সদিচ্ছা প্রকাশ করলেও ডেসপ্যাচের প্রণেতারা শিক্ষা সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যাবেনা বলে নিশ্চিত ছিলেন। তাই তাঁরা গ্রান্ট-ইন-এইড এর মাধ্যমে শিক্ষার জন্য বেসরকারী অর্থায়নের প্রতি এবং মিউনিসিপ্যালিটি, ছাত্র বেতন ও দানশীল ব্যক্তিদের অর্থায়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। শিক্ষা প্রসারে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে যথাযথভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে যথাযথভাবে গুরুত্ব না দেওয়ায় এদেশে সাধারণ শিক্ষার প্রসার হয়েছে অধিক। এতে শিক্ষিত বেকার সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষণীয়। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসন ও পরীক্ষা গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে এর শিক্ষাদানের ব্যাপক সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়েছে। এতসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ডেসপ্যাচের সুপারিশগুলো ছিল অতীব মূল্যবান। এর সাথে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে। এতে বেসরকারী খাতকে শিক্ষা সম্প্রসারণে আগ্রহান্বিত ও উৎসাহিত করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রবেতন তুলনামূলকভাবে কম ছিল এবং ভর্তির নিয়মকানুনও শিথিল ছিল। তাই শিক্ষা হয়ে উঠে জনপ্রিয়। এতেই নিহিত রয়েছে ডেসপ্যাচের সার্থকতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আর্যযুগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে

ক. শিক্ষা বিস্তারে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশন ছিল
খ. শিক্ষা বিস্তারে রাষ্ট্রীয় একাধিক পরিকল্পনা কমিশন ছিল
গ. শিক্ষা বিস্তারে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের অস্তিত্ব ছিল না
ঘ. শিক্ষা বিস্তারে রাষ্ট্র প্রধান ভূমিকা পালন করত।

২। পরিষদ হলো

ক. সংস্কৃত শিক্ষার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান
খ. প্রধানত ব্রাহ্মণ প্রবীণদের সংস্থা
গ. অস্পৃশ্য এবং আদিম অধিবাসীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
ঘ. ইংরেজদের শিক্ষার প্রতিষ্ঠান।

৩। দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার কোন পদ্ধতিটি "বেল পদ্ধতি" নামে ইংল্যান্ডে প্রয়োগ করা হয়?

ক. "পড়ো গুরু" প্রথা খ. "পড়ো জনগণ" প্রথা
গ. "পড়ো সর্দার" প্রথা ঘ. "পড়ো শিক্ষার্থী" প্রথা।

সঠিক উত্তরঃ ১। গ; ২। খ; ৩। গ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বৃটিশ পূর্ব বাংলাদেশে যে তিন ধরনের বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল তার উল্লেখ করুন।
২. "পড়ো সরদার" প্রথা ইংল্যান্ডে কি নামে পরিচিতি লাভ করে এবং এতে ইংল্যান্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয় লিখুন।
৩. "নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতি" কি বুঝিয়ে লিখুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বৃটিশ পূর্ব দেশীয় শিক্ষা পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য লিখুন। দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে এ্যাডামের সম্পর্কিতও সুপারিশগুলোর বিবরণ দিন।
২. কোন আইনকে ভারতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার সন্ধিকাল হিসেবে অভিহিত করা হয়? সনদ আইনে বরাদ্দকৃত ব্যয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্ট মত বিরোধগুলো কি? ভারতের শিক্ষা পরিকল্পনায় সনদ আইন কমিটির সুপারিশগুলোর বিবরণ দিন।
৩. ভারতে মিশনারীদের শিক্ষা সম্পর্কিতকাজগুলো বর্ণনা করুন। উডের ডেসপ্যাচে শিক্ষা উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ আলোচনা করুন।

পাঠ ৬.২ : বৃটিশ শাসনামলে বাংলাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বৃটিশ ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশনের শিক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- স্যাডলার কমিশনের শিক্ষা পরিকল্পনার বিবরণ দিতে পারবেন;
- সার্জেন্ট শিক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

বৃটিশ ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশনের শিক্ষা পরিকল্পনা

বৃটিশ ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন হলো হান্টার কমিশন (ভারতীয় শিক্ষা কমিশন)। ১৮৫৪ সালে ডেসপ্যাচের পর ১৮৮২ সাল পর্যন্ত শিক্ষার অগ্রগতি পরিমাপ এবং শিক্ষা সম্পর্কিত সরকারী নীতিমালা পর্যালোচনার জন্য হান্টার কমিশন গঠিত হয়। হান্টার কমিশন প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও নারী শিক্ষা সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পেশ করে। পরিকল্পনার সুপারিশগুলো নিম্নরূপ:

১. সরকারের পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষা গড়ে তোলার দায়িত্ব জনসাধারণ, জেলা ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, গ্রাম্য ইউনিয়ন, পঞ্চায়েত, প্রাদেশিক সরকার ইত্যাদির উপর থাকবে।

২. বিদ্যালয়ের ফলাফলের ভিত্তিতে আর্থিক অনুদান বিতরণ করা হবে।

৩. স্থানীয় জনগণের দৈনন্দিন চাহিদার ভিত্তিতে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ঘোষণা দেওয়া হয়। প্রত্যেক মহকুমা পর্যায়ে কমপক্ষে একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

৪. প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের বাৎসরিক খরচের এক তৃতীয়াংশ সরকার বহন করবে।

৫. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণ , উদ্যোগ ক্রমশ প্রত্যাহার করে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে।

৬. সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বেতন বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় বেশি করার সুপারিশ করা হয়।

৭. বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে গ্রান্ট-ইন-এইড প্রথার অধীনে আনয়নের পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

৮. সকল সরকারী বিদ্যালয়কে ধর্ম নিরপেক্ষ রাখার এবং বেসরকারী বিদ্যালয়কে তাদের ইচ্ছামত ধর্ম শিক্ষার অনুমতি দানের ঘোষণা প্রদান করা হয়।

৯. মহাবিদ্যালয়ের কর্মচারী সংখ্যা, স্থানীয় চাহিদা, শিক্ষাদানের দক্ষতা প্রভৃতি যাচাই করে আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ নিরূপণের নীতি ঘোষণা করা হয়।

১০. নারী শিক্ষায় বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা হয়। নারী শিক্ষক প্রস্তুত, অনুন্নত সম্প্রদায়ের মেয়েদের শিক্ষা, নারী স্কুল পরিদর্শক নিয়োগ দান, নারীদের জন্য সহজ শিক্ষাক্রম চালু করার সুপারিশ করা হয়।

লর্ড কার্জনের শিক্ষা পরিকল্পনা

লর্ড কার্জন ভারতের শিক্ষা উন্নয়নে দূর সচেষ্ট ছিলেন। জরিপ কার্য পরিচালনার মাধ্যমে তিনি ভারতের শিক্ষার করুণ চিত্রটি সম্পর্কে অবগত হন। ভারতীয় অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলায় উচ্চশিক্ষা ছিল মোটামুটি সস্তা। মাধ্যমিক শিক্ষায় বাংলা ছিল ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের শীর্ষে। তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশেই ইংরেজি মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল বেশি। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে ১০৪ বর্গমাইল এলাকায় মাত্র একটি ইংরেজি মাধ্যমিক স্কুল ছিল। এ সত্ত্বেও ভারতে লেখাপড়ার পরিমাণগত বৃদ্ধি এর গুণগত মানকে ধরে রাখতে পারেনি। সর্বোপরি শ্রেণিকক্ষের স্বল্পতা, স্বল্প বেতনভুক্ত ও অযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী, অঞ্চল ও সম্প্রদায়গুলোর মাঝে ব্যাপক শিক্ষা বৈষম্য প্রভৃতি সমস্যাকে লর্ড কার্জন দূর করতে চেয়েছিলেন।

তাই তিনি ১৯০১ সালে সিমলায় এক শিক্ষা সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সকল স্তরের শিক্ষার সংস্কার ও উন্নয়নের এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর গৃহীত পরিকল্পনা নিম্নরূপ:

১. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষাক্রমের পুনর্গঠন ও ফলাফলের উপর ভিত্তি করে আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়।
২. প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এককালীন ও আবর্তক (Recurring) গ্রান্ট বিতরণের সুপারিশ করা হয়। এতে সরকারকে প্রাথমিক শিক্ষার অর্ধেক ব্যয় বহন করার সুপারিশ করা হয়েছে।
৩. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিগুলোতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়।
৪. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার ও মান উন্নয়নের নীতি ঘোষণা করা হয়।
৫. বৃত্তিমূলকশিক্ষা উন্নয়নে লর্ড কার্জন গুরুত্বারোপ করেন। শিক্ষার্থীদের ১৩ বছর বয়সের পূর্বে ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম না করার নীতি তিনি ঘোষণা করেন।
৬. নারী শিক্ষার জন্য আলাদাভাবে শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ ও বিদ্যালয় পরিদর্শিকা নিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।
৭. শিক্ষাদান করাকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রথম ও প্রধান কাজ বলে ঘোষণা দেওয়া হয়।

স্যাডলার কমিশনের শিক্ষা পরিকল্পনা

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্যক্রমের পর্যালোচনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্গতির সাথে শিক্ষাদান কার্যক্রমের সামঞ্জস্য বিধান, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক গ্লাতক ও গ্লাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার প্রখ্যাত ইংরেজ শিক্ষাবিদ এবং লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে একটি কমিশন গঠন করে। ১৯১৯ সালের শেষদিকে এর রিপোর্ট পেশ করা হয়। এই কমিশনকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনও বলা হয়ে থাকে। এই রিপোর্টের মূল প্রতিবেদনটি পাঁচ খণ্ডে শেষ করা হয়েছে। আটটি খণ্ডে এর পরিশিষ্ট রয়েছে। ভারতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় এই রিপোর্ট দূর মূল্যবান দলিল হিসেবে বিবেচিত। কমিশন মনে করে যে, মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানের উপর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মান নির্ভর করে। তাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সর্বাগ্রে মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার ও পরিকল্পনা প্রয়োজন। মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্য কমিশনের সুপারিশগুলো হল:

১. কমিশনের মতে বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়গুলোর মধ্যে ইন্টারমিডিয়েট পর্যায় হলো বিভাজক। তাই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা দান করতে পারে।
২. সরকার ইন্টারমিডিয়েট কলেজ নামে নতুন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। এ ধরনের কলেজে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রকৌশল, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি অধ্যয়নের সুযোগ থাকবে।
৩. বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, উচ্চ বিদ্যালয় ও সরকারী প্রতিনিধি সমন্বয়ে প্রদেশগুলোতে মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা পরিচালনার জন্য একটি শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হবে।
৪. নারীদের জন্য পর্দা স্কুল ও নারী শিক্ষাবোর্ড স্থাপনের পরিকল্পনা পেশ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজ ও শিক্ষার্থী সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে কমিশন ঘোষণা করে যে,

প্রথমত: ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় ঢাকায় একটি এক কেন্দ্রিক শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় (Unitary Teaching University) প্রতিষ্ঠিত হবে। এটা হবে একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়।

দ্বিতীয়ত: কোলকাতা শহরের সমস্ত সম্পদকে একত্রিত করে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

তৃতীয়ত: মফস্বল এলাকার কলেজগুলোকে এমনভাবে উন্নত করতে হবে যাতে ধীরে ধীরে উচ্চ শিক্ষার সম্পদগুলো একত্রিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে।

চতুর্থত: মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স কোর্স চালুর এবং কম মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য পাস কোর্স রাখার প্রস্তাবকরা হয়।

পঞ্চমত: ইন্টারমিডিয়েট পাশের পর ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদ তিন বছর রাখার প্রস্তাবরাখা হয়।

ষষ্ঠত: শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কথা বিবেচনায় রেখে মুসলমান শিক্ষার্থীদের সহায়তার জন্য সম্ভাব্য পদক্ষেপ নেয়ার পরিকল্পনা পেশ করা হয়।

কমিশন আর যে সকল বিষয়ে সুপারিশ রাখে তা হল:

শিক্ষক প্রশিক্ষণ: ঢাকা ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ বিভাগ চালুর মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনা পেশ করে। ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রি পর্যায়ে শিক্ষাতত্ত্বকে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা প্রদান করে।

কারিগরী ও প্রযুক্তি: বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে কারিগরী ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি এবং এগুলোর ধারাবাহিক পাঠ শেষে কৃতকার্য শিক্ষার্থীকে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি প্রদানের পরিকল্পনা করা হয়।

পেশাগত ও বৃত্তিমূলকশিক্ষা: পেশাগত ও বৃত্তিমূলকশিক্ষার উপর কমিশন গুরুত্বারোপ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব স্তরে এ শিক্ষা বাস্তবায়নে কমিশন পরিকল্পনা পেশ করে।

সার্জেন্ট পরিকল্পনা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশ ভারতের জন্য একটি শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করাই ছিল সার্জেন্ট পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। সার্জেন্ট পরিকল্পনায় ১৯৩৫ সালের পর কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের গৃহীত প্রস্তাবের সাথে খের কমিটি, ওয়ার্ধা পরিকল্পনা, উড অ্যাবট কমিটির সুপারিশগুলোর সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। সার্জেন্ট পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা প্রভৃতির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সার্জেন্ট পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হল:

১. এটি ছিল ৪০ বছরের (১৯৪৪-৮৪) একটি শিক্ষা পরিকল্পনা।
২. এতে শিক্ষার জন্য বার্ষিক ৩,১২৬ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।
৩. স্থানীয় পরিবেশের সাথে সংগতি রক্ষা করে হস্তশিল্পের উপর গুরুত্ব দিয়ে করে এতে প্রাথমিক শিক্ষায় বুনিয়াদি শিক্ষার পরিকল্পনা গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়।
৪. ৩-৬ বছরের শিশুদের জন্য অবৈতনিক নার্সারী শিক্ষার পরিকল্পনা পেশ করা হয়।
৫. ৬-১৪ বছরের ছেলে মেয়েদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার পরিকল্পনা করা হয়।
৬. ১১-১৭ বছর বয়সের ছেলে মেয়েদের মাধ্যমিক শিক্ষা দানের পরিকল্পনা করা হয়।
৭. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নির্বাচিত হবে প্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা ও মেধার ভিত্তিতে। মেধার ভিত্তিতে নির্বাচিত শতকরা ২০ জনকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ দেওয়া হবে।
৮. বালিকা বিদ্যালয়ে স্বতন্ত শিক্ষাক্রম থাকবে। এতে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা এবং ইংরেজিকে দ্বিতীয় বাধ্যতামূলক ভাষা হিসেবে শিক্ষা দেওয়া হবে।
৯. মাধ্যমিক শিক্ষাকে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাস্তর হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।
১০. দেশের শিল্পোন্নয়ন এবং শিল্পের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে কারিগরী ও বৃত্তিমূলকশিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনা নেয়া হয়।
১১. মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও সঞ্জীবনী কোর্স প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করা হয়।
১২. যে সকল শিক্ষার্থী মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করবে তাদের প্রতি ১৫ জনের মধ্যে একজনকে মেধা, যোগ্যতা ও চাহিদার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করা হয়।
১৩. বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণে পরিকল্পনা নেয়া হয়।
১৪. স্নাতকোত্তর পর্যায়ে গবেষণা পরিচালনা করার পরিকল্পনা পেশ করা হয়।
১৫. জনগণের চাহিদা মাফিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রতি সার্জেন্ট কমিটি গুরুত্বারোপ করে।

১৬. শিক্ষার জন্য বার্ষিক ৩১২৬ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ের যে পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয় তার উৎস সম্পর্কে বলা হয় যে, ৩৫৬ মিলিয়ন টাকা বা ১১% (প্রায়) পাওয়া যাবে শিক্ষার্থীদের বেতন ও অন্যান্য উৎস থেকে। অবশিষ্ট ২৭৭০ মিলিয়ন টাকা বা ৮৯% (প্রায়) পাওয়া যাবে জনগণ থেকে প্রাপ্ত সরকারী ট্যাক্স/কর থেকে।

সমালোচনা

হান্টার কমিশন: হান্টার কমিশনের পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে স্থানীয় সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আবার বিভিন্ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসার দরুন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নিজস্ব স্বকীয়তাও হারিয়ে ফেলে। গ্রান্ট-ইন-এইড প্রথা এদেশে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল। শিক্ষার্থীদের বেতন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কম থাকায় এবং ভর্তির নিয়ম কিছুটা শিথিল হওয়ায় শিক্ষা গ্রহণ এদেশে কিছুটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এক্ষেত্রে হান্টার কমিশনের সফলতাই প্রতীয়মান হয়। এতদ্ব্যতীত নারী শিক্ষায় বেসরকারী সমর্থন, নারী পরিদর্শক নিয়োগ প্রভৃতি নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে সহায়ক হয়েছিল।

শিক্ষা পরিকল্পনায় কিছুটা সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও হান্টার কমিশন বিদ্যালয়ের ফলাফলের ভিত্তিতে অনুদান বিতরণের নীতির মাধ্যমে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই নীতির কারণে অনেক শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনই শেষ হয়ে যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে বাৎসরিক খরচের এক তৃতীয়াংশ সরকার কর্তৃক বহনের পরিকল্পনার কথা বলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আকাঙ্খাকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে।

লর্ড কার্জনের শিক্ষা পরিকল্পনা: লর্ড কার্জন শিক্ষাক্ষেত্রে তের বছর বয়স পর্যন্ত মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষার অর্ধেক অংশ ব্যয় সরকার বহন করায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যয় কমেছিল। কিন্তু লর্ড কার্জনের অন্যান্য পরিকল্পনাগুলো ছিল বাংলা তথা ভারতবর্ষের শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে ভারতবাসীকে অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করার কৌশল। তবে নানামুখী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেও কার্জন এদেশের শিক্ষাকে তার আকাঙ্খানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি।

স্যাডলার পরিকল্পনা: স্যাডলারের শিক্ষা পরিকল্পনায় ইন্টারমিডিয়েট পাসকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা বলে নিরূপণ করা হয়। নারী শিক্ষা, বৃত্তিমূলকও পেশাগত শিক্ষা এবং পশ্চাৎপদ মুসলমানদের শিক্ষার উন্নয়নে তিনি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এছাড়া তিনি কারিগরী ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু স্যাডলারের শিক্ষা পরিকল্পনায় বার বার অর্থায়নের উপর গুরুত্বারোপ করা সত্ত্বেও অর্থায়নের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট উৎসের উল্লেখ করা হয় নি। ফলে পরিকল্পনায় বর্ণিত সকল উদ্দেশ্যই অসার হয়ে পড়ে।

সার্জেন্ট পরিকল্পনা: ভারতের বৃটিশ শাসনামলে যতগুলো শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছিল তন্মধ্যে সার্জেন্ট পরিকল্পনা গুণগত দিক থেকে দূর উঁচু মানের ছিল। পরবর্তীতে এদেশের শিক্ষা পরিকল্পনার অনেক উপাদানই সার্জেন্ট পরিকল্পনা থেকে গৃহীত হয়েছিল। এতে শিক্ষার সকল ক্ষেত্রের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। এতে বুনিয়াদি শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা গবেষণা, বয়স্ক শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে। তবে পরিকল্পনায় যে দীর্ঘ সময়ের উল্লেখ রয়েছে তা সমালোচনার দাবী রাখে। পরিকল্পনায় যে অর্থ বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতি বছর মুদ্রাস্ফীতির নিরিখে তা সংশোধনের আভাষ ছিল না। এতদ্ব্যতীত পরিকল্পনার অর্থায়নে সুনির্দিষ্টভাবে উৎসের উল্লেখ ছিল না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। হান্টার কমিশন-

ক. উচ্চ শিক্ষা উন্নয়নে পরিকল্পনা পেশ করে
খ. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও নারী শিক্ষা উন্নয়নে পরিকল্পনা পেশ করে
গ. প্রাথমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়নে পরিকল্পনা পেশ করে
ঘ. বয়স্ক শিক্ষার উন্নয়নে পরিকল্পনা পেশ করে।

২। লর্ড কার্জনের জরিপের তথ্যানুসারে বাংলাদেশে কত বর্গ মাইলে একটি ইংরেজি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল?

ক. ১০৮ খ. ১০৬
গ. ১০৪ ঘ. ১০২।

৩। লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে গঠিত কমিশনকে বলা হত-

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন
খ. কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন
গ. দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন
ঘ. আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন।

৪। সার্জেন্ট শিক্ষা পরিকল্পনা কত বছর মেয়াদী ছিল?

ক. ৪০ খ. ৫০
গ. ৬০ ঘ. ৭০

সঠিক উত্তরঃ ক) ১। খ ২। গ ৩। খ ৪। ক।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হান্টার কমিশন প্রণীত শিক্ষা পরিকল্পনার সমালোচনা লিপিবদ্ধ করুন।
২. "সার্জেন্ট পরিকল্পনা গুণগত দিক থেকে দূরউঁচু মানের ছিল" ব্যাখ্যা করুন।
৩. স্যাডলারের শিক্ষা পরিকল্পনার সুবিধা এবং দুর্বলতাগুলো উল্লেখ করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বৃটিশ ভারতে হান্টার কমিশনের শিক্ষা পরিকল্পনা এবং লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার পরিকল্পনার বিবরণ দিন।
২. মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে স্যাডলার পরিকল্পনার সুপারিশগুলো আলোচনা করুন।
৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের শিক্ষা উন্নয়নে সার্জেন্ট পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহের বিবরণ দিন।

পাঠ ৬.৩ : পাকিস্তান শাসনামলে বাংলাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পাকিস্তান শাসনামলে (১৯৪৭-১৯৭১) প্রণীত শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য দিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পাকিস্তান শাসনামলে গৃহীত তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশের শিক্ষার জন্য প্রণীত লক্ষ্য ও কৌশল সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারবেন এবং
- ১৯৪৭-৭১ পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষার গতি- প্রকৃতি ও অর্থায়নের ধারার বিবরণ দিতে পারবেন।

১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারত উপমহাদেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা স্বাধীন জাতির চাহিদা পূরণে অথবা অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী ছিল না। এই শিক্ষা ছিল তৎকালীন বাংলাদেশে বৃটিশ প্রশাসনের জন্য নিম্নপদস্থ কর্মচারী সৃষ্টির আঙ্গিকে প্রণীত। এদেশে তাদের শোষণ, শাসন, নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার দোভাষী বা “রুচিতে, ভাবধারায়, নীতিতে ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরেজ” তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের দীর্ঘকালের সংগ্রামের ফসল হিসেবে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পূর্ব বাংলা অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ প্রায় ১২০০ মাইল দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তথাকথিত ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিক্ষার অধিকার বঞ্চিত বাংলাদেশের জনগণ আশা করেছিল স্বাধীনতার পর এদেশের ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বলে উঠবে এবং বৈষম্যমূলক শিক্ষা পরিকল্পনা এদেশ থেকে চিরতরে দূরীভূত হবে।

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর বিভিন্ন শিক্ষা সম্মেলন এবং ১৯৫২ সালের বঙ্গীয় শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিটি ছাড়াও ১৯৫৭ সালে পূর্ব বঙ্গের শিক্ষা সংস্কার কমিশনের নিকট থেকে শিক্ষা সম্পর্কিত নানা ধরনের সুপারিশ পাওয়া গিয়েছিল। এদেশে সামরিক শাসক আইয়ুব খানের সময়ে দু'টি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল। তন্মধ্যে প্রথম কমিশনটি গঠিত হয়েছিল ১৯৫৯ সালে যা শরিফ কমিশন নামে পরিচিত। দ্বিতীয় শিক্ষা কমিশনটি গঠিত হয় ১৯৬৪ সালে বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে আইউব সরকারের পতনের পর সর্বশেষ শিক্ষা কমিশনটি গঠিত হয়।

আতাউর রহমান খান কমিশন

১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান সরকার বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠনের জন্য যে কমিটি গঠন করে তার মূলবিষয়গুলো হল:

১. দেশের দারিদ্র দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত ও সুসমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

২. সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হবে।

৩. মানুষের নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্যাপকভাবে গণস্বাক্ষরতার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে।

৪. দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নয়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত সমন্বিত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

৫. মাতৃভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হবে। তবে জুনিয়র হাই স্কুল পর্যায়ে একজন শিক্ষার্থী দুইটি ভাষা শিক্ষা লাভ করবে।

৬. একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হবে।

৭. মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে সংগঠিত করা হবে।

৮. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষক গড়ে তোলা হবে।

৯. দেশের সকল শ্রেণির মানুষ ও সকল এলাকার শিক্ষা উন্নয়নে পর্যায়ক্রমে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক বিনিয়োগ করা হবে।

সমালোচনা

১৯৫৭ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানেরশিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার ও পুনর্গঠন কমিটির শিক্ষা সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলো বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতি উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছিল। এতে দেশের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা এবং দরিদ্রতা দূরীকরণে শিক্ষাকে দূর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণের এবং একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষার প্রস্তাবনা প্রশংসার দাবী রাখে। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রচুর আর্থিক বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু অর্থ বা সম্পদের উৎস সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য এতে দেখা যায় না। তবে পর্যায়ক্রমে বিনিয়োগের সুপারিশ করে কমিশন শিক্ষাকে সম্ভবত একটা দীর্ঘ মেয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছে।

শরিফ ও হামুদুর রহমান কমিশন

সামরিক শাসক আইউব খানের আমলে গঠিত শরিফ কমিশন ও হামুদুর রহমান কমিশন ছিল দূও বিতর্কিত। শরিফ কমিশনের দায়িত্ব ছিল জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়ণ করা। হামুদুর রহমান কমিশনের দায়িত্ব ছিল ছাত্রদের সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে তা দূর করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা এবং ছাত্রদের কল্যাণে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনার সুপারিশ করা। এ সময়ে পাকিস্তানে বিভিন্ন জরিপ, সমীক্ষা, তথ্য, পরিসংখ্যান প্রভৃতির ফলাফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষা পরিকল্পনা ও শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছিল। শরিফ কমিশনের সুপারিশগুলো হল:

১. দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
২. মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো বাধ্যতামূলক বিষয়ের পাশাপাশি কারিগরী ও বৃত্তিমূলকবিষয়গুলো ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৩. মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডকে ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার দায়িত্ব দিতে হবে।
৪. সম্মান পাশ ও ডিগ্রি কোর্সের মেয়াদ তিন বছর করা হবে।
৫. মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক স্তরের পর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা বৃত্তির ব্যবস্থা রাখা হবে।
৬. দেশের নারী শিক্ষা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সুযোগের ব্যবস্থা করা হবে।
৭. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অর্থায়নে সরকার শতকরা ৫০ ভাগ ব্যয় বহন করবে এবং জনগণ শতকরা ৫০ ভাগ বহন করবে। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের শতকরা ৬০ ভাগ শিক্ষার্থীদের বেতন থেকে মিটাতে হবে এবং বাকী শতকরা ৪০ ভাগ সরকার বহন করবে। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে জনগণ বর্তমানের তুলনায় আরো বেশি পরিমাণে ব্যয় নির্বাহ করবে।
৮. নারী শিক্ষার প্রসারকল্পে সরকারকে আরো বেশি সহযোগিতার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে গুণগত কোন পরিবর্তনের সুপারিশ করেনি। ১৯৬৯ সালে আইউব খানের পতনের পর এয়ার মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল। এতে শিক্ষা সম্পর্কে গণতান্ত্রিক, উদার ও প্রগতিশীল বক্তব্য ছিল। কিন্তু বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে পাকিস্তানী শাসকেরা এই শিক্ষা পরিকল্পনা নিয়ে বেশি দুর অগ্রসর হতে পারেনি।

শরিফ কমিশনের শিক্ষা পরিকল্পনার সমালোচনা

শরিফ কমিশন শিক্ষাকে মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করেছে। এতে উচ্চতর শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা এবং গবেষণা সম্প্রসারণের দৃষ্টিভঙ্গিও এতে প্রকাশ পেয়েছে। কারিগরী ও প্রযুক্তিগত এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার আকাঙ্খা ব্যক্ত করা হয়েছে। নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার আহবানও এতে রয়েছে। শিক্ষার অর্থায়নে প্রধান উৎস হিসেবে বেসরকারী খাতকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু শরিফ কমিশনের অনেকগুলো পরিকল্পনাই যথাযথ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।

পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা পরিকল্পনা

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর সরকার তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা(১৯৫৫-১৯৬০, ১৯৬০-১৯৬৫, ১৯৬৫-১৯৭০) গ্রহণ করে। এসব পরিকল্পনায় শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য নানাবিধ সুপারিশ করা হয়। শরিফ কমিশন, হামুদুর রহমান কমিশনের শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশগুলো এসব পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হয়। তবে এর পূর্বে ১৯৫১ সালে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি দশ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। যার উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনাগুলো ছিল প্রথমত দশ বছরে বাংলাদেশে পঁচিশ হাজার অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন; দ্বিতীয়ত প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস এবং তৎসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট থেকে এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এধরনের তিনজন শিক্ষক কর্তৃক এক একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করা; তৃতীয়ত দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও জুনিয়র প্রাথমিক শ্রেণির মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং চর্তুত পঞ্চম শ্রেণি থেকে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা প্রবর্তনের পরিকল্পনা নেয়া হয়।

কিছুদিন পরিকল্পনা অনুযায়ী চলার পর সরকার অর্থাভাবের কারণ দেখিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের বিশেষত নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা বন্ধ করে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করে।

পাকিস্তানের তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশের শিক্ষা সম্পর্কে গৃহীত সুপারিশগুলো হল:

১. ১৫ বছর সময়ের মধ্যে ৬-১৫ বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা।

২. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা, স্কুলের শ্রেণি ও সেকশন অনুপাতে নির্ধারিত হবে। প্রতি ৪০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক থাকবেন।

৩. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে প্রবেশিকা পাস ও দু'বছরের প্রশিক্ষণ।

৪. মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার জন্য পাঁচ বছরের প্রাথমিক ও ছয় বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করার সুপারিশ করা হয়।

৫. মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম তিন বছরে জুনিয়র হাই স্কুল, পরবর্তী তিন বছরে সিনিয়র হাই স্কুল বা মোট ছয় বছর নিয়ে সিনিয়র হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়।

৬. দেশের পঞ্চাশ হাজার জনসংখ্যা অধ্যুষিত এলাকায় একটি সিনিয়র হাইস্কুল এবং পঁচিশ হাজার জনসংখ্যা অধ্যুষিত এলাকায় একটি জুনিয়র হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়।

৭. নারী শিক্ষায় উৎসাহ দেওয়ার নিমিত্তে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষ শ্রেণি পর্যন্ত বিনা বেতনে নারী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের পরিকল্পনা নেয়া হয়।

৮. মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। তবে যাদের উচ্চতর শিক্ষা লাভের আকাঙ্খা থাকবে তারা ইংরেজিকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অধ্যয়ন করতে পারবে।

৯. মাধ্যমিক স্তরে কলা, গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষায় ভারসাম্য আনা এবং শিক্ষার্থীদের কৃষি, শিক্ষকতা, সমাজ কল্যাণ, ব্যবসা ও শিল্পে দক্ষতা অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।

১০. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ, কারিগরী ও পেশাভিত্তিক শিক্ষার মান উন্নয়নে পরিকল্পনা পেশ করা হয়।

১১. "জাতি গঠনে শিক্ষা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ" এ বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার অপরিহার্যতাকে পরিকল্পনায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

১২. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের সুপারিশ পরিকল্পনায় ব্যক্ত করা হয়।

১৩. পরিকল্পনায় মাদ্রাসা শিক্ষাকে সংস্কার করে তৎকালীন উচ্চবিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সাথে সমন্বয় সাধনের সুপারিশ করা হয়।

পাকিস্তান শাসনামলে গৃহীত তিনটি শিক্ষা পরিকল্পনায় বাংলাদেশের সমাজ, অর্থনীতি এবং শিক্ষার কতটুকু উন্নতি সাধিত হয়েছে এর একটি সমালোচনামূলক পাঠ আলাদাভাবে না করেও শিক্ষার গতি প্রকৃতি, অর্থায়ন প্রভৃতিকে ব্যাখ্যা করলেই সমালোচনার মূল বিষয়বস্তু পাওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) স্বীকার করা হয়েছে যে, ১৯৪৭-৪৮ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২৯,৬৩৩টি যা কমে ১৯৬০-৬১ সালে দাঁড়িয়েছে ২৬,৬৬৫টিতে। এতে দেখা যায় প্রায় শতকরা ১০টি স্কুল বন্ধ হয়েছে গেছে। সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাগত নিম্নমুখীতাকে ঊর্ধ্বমুখী করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ১৯৭২-৭৩ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০,৪৪৬টিতে। এক্ষেত্রে দেখা যায় পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা পরিকল্পনা বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে তেমন গুরুত্বপূর্ণ অবদান তো রাখেনি বরং এ সময়কালে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বাংলাদেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক সামাজিক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেনি। তাই দেখা যায়, ১৯৫১-৬১ সালে বাংলাদেশে নিরক্ষরতার হার ৭৮.৯০% থেকে ৮২.৩৯% ছিল। কিন্তু ১৯৪৭-১৯৭৩ কালপর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৬ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬০ লক্ষ হয়েছে। এক দিকে নিরক্ষরতা বৃদ্ধি অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যাগত বৃদ্ধিকে পরিকল্পনা কমিশন ব্যাখ্যা করেছে দু'ভাবে। প্রথমত: দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়ত: মেয়ে শিক্ষার্থীদের অনেকেই স্কুলে গেলেও সাক্ষরতা লাভের পূর্বেই স্কুল পরিত্যাগ করেছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯৬০-৭০ সালের হিসেবে দেখা যায় যে, বিদ্যালয়ের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে একইভাবে স্কুল শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি হয়েছে। কারণ পূর্ববর্তী জুনিয়র হাইস্কুলের অনেকগুলোকে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। তাই জুনিয়র হাই স্কুলের সংখ্যা ২১৭৫ থেকে কমে ১৮১১ হয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও ১১-১৫ বছর বয়সের স্কুল গমনোপযোগীদের মাত্র ১৭% স্কুলে গিয়েছে। তবে এ সময়কালে মানবিক বিদ্যা ব্যতীত বাণিজ্য, বিজ্ঞান, কৃষি প্রভৃতি ধারা সৃষ্টির মাধ্যমে এবং পাঠক্রম ও শিক্ষা দানে নতুন পদ্ধতি প্রয়োগের সাহায্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বহুমুখী শিক্ষার প্রচলন হয়। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ছিল অবহেলিত। স্কুলসমূহে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যাও আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়নি। ১৯৭২ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে ৩৯% শিক্ষকের এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭২% শিক্ষকের কোন প্রশিক্ষণ ছিল না। শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা কমে যাওয়ায় এবং সামান্য আয়ের দরুন শিক্ষিত ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা শিক্ষকতা পেশার প্রতি আকৃষ্ট হতো না।

মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার প্রতি মানুষের আকর্ষণ বৃদ্ধির ফলে শহর এবং গ্রামগুলোতে মাধ্যমিক পাস করা শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এরই ফলশ্রুতিতে মাধ্যমিক বা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোর অনেকগুলোই পরবর্তীতে ডিগ্রি কলেজে রূপান্তরিত হয়। তাই কলেজের সংখ্যা এবং শিক্ষার্থী বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্যণীয়।

প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের তুলনায় উচ্চ শিক্ষায় অধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলে উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে সামাজিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে যুগোপযোগীভাবে গড়ে তোলা হয়নি। এতে গতানুগতিক বিষয়গুলো পড়ানোর প্রতিই বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা ব্যাপক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৪৭ সালে ১২৫ জন শিক্ষার্থী প্রকৌশল শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত, তদস্থলে ১৯৭০ সালে প্রায় ৩০০০ শিক্ষার্থীর প্রকৌশল শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। একইভাবে প্রকৌশল ডিপ্লোমা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টির সুযোগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়নি। তাই শিল্পায়ন ও সময়ের চাহিদা পূরণে এসকল প্রতিষ্ঠান আশানুরূপ অবদান রাখতে পারেনি।

বয়স্ক শিক্ষা ও সাক্ষরতা অর্জনের প্রতি শিক্ষা পরিকল্পনায় কম মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে সমাজে তাদের অবদান সম্পর্কে সচেতন করার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের শিক্ষা পরিকল্পনা আশানুরূপ অবদান রাখতে পারেনি। ফলে জনগণের প্রায়োগিক সাক্ষরতার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে।

১৯৪৭ সালের পূর্বে বাংলাদেশের শিক্ষায় অর্থায়নের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সরকারী খাতের তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের অর্থায়নই বেশি ছিল। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর এদেশের মানুষ শাসকদের নিকট থেকে বৈষম্যমূলক শিক্ষা পরিকল্পনা আশা করেনি। কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত পর দেখা গেল যে, সরকারী কার্মকান্ডে বাংলাদেশের মানুষের আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেনি। ১৯৬১-৬২ সালের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে কেবলমাত্র পেশাভিত্তিক শিক্ষা ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের ব্যয়ের পরিমাণ সরকারী খাতের ব্যয়ের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশের মানুষের শিক্ষার প্রতি পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক শিক্ষা পরিকল্পনা নিম্নের সারণি থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়।

সারণি- ১

পাকিস্তানের শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী শিক্ষাব্যয় (মিলিয়ন টাকা)

সময়কাল	মোট ব্যয়	পূর্ব-পাকিস্তান	শতকরা হার	পশ্চিম পাকিস্তান	শতকরা হার
১৯৪৭-৪৮	৩৪.৭	১২.৪	৩৫.৭৩	২২.৩	৬৪.২৭
১৯৫২-৫৩	১০৪.৩	৪৩.৬	৪১.৮০	৬০.৭	৫৮.২০
১৯৫৬-৫৭	১৩৯.৩	৪৩.২	৩১.০১	৯৬.১	৬৮.৯৯
১৯৬৭-৬৮	৭১৩.৯	৩৪৮.৬	৪৮.৮৩	৩৬৫.৩	৫১.১৭

উৎস: পাকিস্তানের শিক্ষা পরিসংখ্যান ১৯৪৭-৪৮ এবং পাকিস্তান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ার বুক ১৯৬৮, সারণি ১৯৮ ও ১৯৯।

সারণি-১ থেকে বোঝা যায় যে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা বেশি হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী অর্থায়নে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ ছিল অবহেলিত। সারণি থেকে ধারণা করা যায় যে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী অর্থায়ন কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও তা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় ছিল অনেক কম। ৬০ এর দশকে এদেশের মানুষের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১৯৬৭-৬৮ সালে এদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছুটা অর্থায়ন বেড়েছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে শিক্ষাখাতে পূর্ব পাকিস্তানে মাথাপিছু সরকারী ব্যয় ছিল ৪.৬০ টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ২০.৭২ টাকা। ১৯৫৬-৫৭ সালের পাকিস্তানের শিক্ষা পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ঐ সময়ে বাংলাদেশে শিক্ষার্থীর মাথা পিছু সরকারী ব্যয় ছিল ১২.৩৮ টাকা, একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু সরকারী ব্যয় ছিল ৪২.২২ টাকা। এ থেকে বলা যায় পাকিস্তান সৃষ্টির পর এদেশের জনগণের শাসনকারী বদলেছে, কিন্তু শিক্ষা ও ভাগ্যের তেমন উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেনি। পাকিস্তান আমলের শিক্ষা পরিকল্পনা ছিল বাংলাদেশের মানুষকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করার সরকারী রূপরেখা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশ পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়-
ক. ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে
খ. বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে
গ. আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে
ঘ. ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে।

২। ইংরেজরা বাংলাদেশে শিক্ষার মাধ্যমে কি তৈরি করতে চেয়ে ছিল?
ক. "রুচিতে, ভাবধারায়, নীতিতে ও বুদ্ধিবৃত্তিতে বাঙালী"
খ. "রুচিতে, ভাবধারায়, নীতিতে ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরেজ"
গ. "রুচিতে, ভাবধারায়, নীতিতে ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ভারতীয়"
ঘ. "রুচিতে, ভাবধারায়, নীতিতে ও বুদ্ধিবৃত্তিতে পাকিস্তানী"।

৩। ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার ও পুনর্গঠন কমিটি-
ক. উর্দু ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণের সুপারিশ করে
খ. ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণের সুপারিশ করে
গ. মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণের সুপারিশ করে
ঘ. উর্দু ও ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণের সুপারিশ করে।

৪। ১৯৫৬-৫৭ সালে শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ব্যয় ছিল-
ক. বাংলাদেশে ১২.৩৮ টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৪২.২২ টাকা
খ. বাংলাদেশে ৪.৬০ টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ২০.৭২ টাকা
গ. বাংলাদেশে ৩৩.২০ টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১২.৮০ টাকা
ঘ. বাংলাদেশে ৯.০০ টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে ৪.৬০ টাকা।

সঠিক উত্তরঃ ক) ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশনের একটি সমালোচনা লিখুন।
২. পাকিস্তানের শাসনামলে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার নিম্নমুখী প্রবণতা ও এর কারণগুলো উল্লেখ করুন।
৩. বাংলাদেশে শিক্ষার অর্থায়নে পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি ব্যাখ্যা করুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বৃটিশ ভারতে শিক্ষার প্রকৃতি কিরূপ ছিল? আতাউর রহমান খান ও শরিফ কমিশনের শিক্ষা উন্নয়ন সম্পর্কিত সুপারিশগুলো লিখুন।
২. পাকিস্তান আমলে গৃহীত তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশের শিক্ষা উন্নয়নে যেসব সুপারিশ করা হয়েছে তার বিবরণ দিন।
৩. পাকিস্তান আমলে গৃহীত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষার গতিপ্রকৃতি, অর্থায়ন ইত্যাদিতে যে প্রভাব পড়েছে তা আলোচনা করুন।

পাঠ ৬.৪ : স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনা (১৯৭২-৭৮) ও কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) উদ্দেশ্যাবলী, কৌশলাদি প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে ও বিবৃত করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের শিক্ষার পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে **১৯৭১** সালে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে নতুন একটি দেশের সৃষ্টি হলো। প্রায় দু'শো বছরের বৃটিশ শাসন, চব্বিশ বছরের পাকিস্তানী শোষণ ও বৈষম্যমূলক শিক্ষা পরিকল্পনা, মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে প্রচন্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি নিয়ে এদেশের শিক্ষার অগ্রযাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সংবিধানে "সকল শিশুকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা" প্রদানের জন্য একই মানসম্পন্ন গণমুখী এবং সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে শিক্ষাকে সমাজের চাহিদার সাথে সম্পৃক্ত করার কথা বলা হয়েছে।

আইন দ্বারা স্বীকৃত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ঘোষণা দেওয়া হয়। সরকার ঘোষণা করে যে, শিক্ষাকে অবশ্যই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো কার্যকর করার সুপারিশ প্রদানের জন্য শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলিতে বলা হয় যে-

প্রথমত: শিক্ষাকে জাতীয় প্রয়োজনীয়তার প্রতি অনুকূল হতে হবে। একে ভবিষ্যৎ কর্ম জীবন ও উৎপাদনশীল কাজের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হতে হবে।

দ্বিতীয়ত: শিক্ষা ব্যবস্থাকে আনুষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদসৃষ্টি করতে হবে।

তৃতীয়ত: সকল নাগরিকের যে কোন বয়সে একটা সামান্যতম পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করার অধিকার থাকবে। এক্ষেত্রে উন্মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দমত জ্ঞানের বিস্তার ঘটাতে পারে। সকল শিশুকে প্রাথমিক পর্যায়ে মৌলিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

চতুর্থত: গ্রাম অথবা শহরে এবং সরকারী বা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বত্র শিক্ষার ন্যূনতম মৌলিক সুবিধাগুলোর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

পঞ্চমত: শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেখতে হবে সমষ্টিগতভাবে এবং বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ) একই ধরনের লক্ষ্য থাকবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেশের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

ষষ্ঠত: শিক্ষাকে জনগণের সাংস্কৃতিক অর্জনকে সমৃদ্ধ করার উপযোগী হতে হবে প্রভৃতি।

এসকল উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে সব কৌশলের কথা বলা হয়েছে তা হল:

১. শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক এবং শিক্ষার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি বর্ধিতভাবে প্রেরণ করা হবে যাতে তুলনামূলকভাবে ভাল শিক্ষা দেয়া যায় এবং বেশি পরিমাণে শিক্ষার্থীর আগমন ঘটে। অধিক পরিমাণে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে দুই শিফটও চালু করা যেতে পারে।

২. ভালভাবে যন্ত্রপাতি সজ্জিত ল্যাবরেটরী ও ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে স্কুল ও কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার মান বাড়াতে হবে।

৩. বিভিন্ন স্তরে বৃত্তিমূলকও কারিগরী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
৪. যারা স্কুলে যেতে পারবেনা সেসব শিক্ষার্থীদের বয়সভেদে স্কুল সংলগ্ন ল্যাবরেটরীতে এবং বৃত্তিমূলকপ্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন ওয়ার্কশপে নানামুখী দক্ষতা অর্জনমূলক কাজে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
৫. মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মনোনীত শিক্ষার্থীরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে। দেশের বর্ধিত অর্থনীতির বিভিন্ন সেক্টরের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ তৈরি করবে।
৬. দেশব্যাপী কার্যকরভাবে বয়স্ক শিক্ষা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এ লক্ষ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীদের এবং গণমাধ্যম বিশেষত রেডিও, টেলিভিশনকে ব্যবহার করা হবে।
৭. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতর ও বাহিরে স্পোর্টস ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা হবে।
৮. নারী শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হবে। নারীদের মধ্য থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যাবলি ও কৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা সারণি-২ এর মাধ্যমে দেখানো হল:

সারণি- ২
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ১৯৭৩-১৯৭৮

স্তর	মজুদ (Stock) তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থী জুন- ১৯৭২ (লক্ষ)	অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর তালিকাভুক্তি (লক্ষ)	মোট তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীর মজুদ জুলাই ১৯৭৮ (লক্ষ)	শতকরা বৃদ্ধি	মোট তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীদের শতকরা হার	মোট বিনিয়োগ (কোটি টাকা)
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬০.০০	২৫.৯৪	৮৫.৯৪	৪৩	৭২.৪	৫৭.৭২
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৭.০০	৯.৬২	২৬.৬২	৫৭	২২.৫	৫৯.৮৮
শিক্ষক প্রশিক্ষণ	০.১০	০.১৫	০.২৫	১৫০	০.২	১৬.০০
কলেজ	৩.২৮	১.৭২	৫.০০	৫২	৪.২	২৪.৭০
ইন্টারমিডিয়েট	২.৩০	১.২০	৩.৫০	৫২	-	-
ডিগ্রি	০.৯৮	০.৫২	১.৫০	৫৩	-	-
কারিগরী শিক্ষা	০.১৮	০.৩২	০.৪৯	১৭২	০.৪	৫০.০০
বিশ্ববিদ্যালয়	০.২৪	০.১৫	০.৩৯	৬৩	০.৩	৩৫.০০
					মোট	**= ২৪৩.৩০**

উৎস: প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৭৩-৭৮, পৃঃ ৪৫০, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষাক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৫০ কোটি টাকা। তন্মধ্যে সরকারী খাতের বিনিয়োগ ধরা হয়েছে ৩১৬ কোটি টাকা এবং বেসরকারী খাতের বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৪ কোটি টাকা। দেশের সমগ্র অর্থনীতিতে যে পরিমাণ সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগের পরিকল্পনা করা হয়, তন্মধ্যে শিক্ষায় সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগ হলো মোট বিনিয়োগের ৭.১%। পাকিস্তান আমলে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫%-৬%। সারণি-২ থেকে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে যেসব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা সহজেই বোধগম্য। ১৯৭২ সালের জুন মাসে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ। পরিকল্পনাবিদগণ ১৯৭৮ সালের জুলাই পর্যন্ত আরো ২৫.৯৪ লক্ষ অতিরিক্ত শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন। এই বর্ধিত শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় ৫৭.৭২ কোটি টাকা। সারণি-২ থেকে জানা যায় যে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য সরকার মোট ২৪৩.৩০ কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। অতএব শিক্ষাখাতে মোট বিনিয়োগ থেকে ২৪৩.৩০ কোটি টাকা বাদ দিলে বাকি ১০৬.৭০ কোটি টাকা প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন ধরনের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের লক্ষ্য সম্পর্কে সারণি- ২ থেকে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়াও এতে নারী শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নারী শিক্ষা বৃদ্ধিকল্পে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারীদের শিক্ষয়িত্রী হিসেবে নিয়োগ দানের পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছে। স্বল্প শিক্ষিত

নারীদের নিম্ন ক্লাসে পড়ানোর প্রচেষ্টা সম্পর্কে পরিকল্পনায় সুপারিশ করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত নারীদের খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগদান, বিভিন্ন বৃত্তিমূলক বিষয়ের শিক্ষাদানের জন্য নিয়োগ প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। স্থানীয় চাহিদা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ, স্থানীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বয়স্ক সাক্ষরতা ও গণ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন এলাকায় পরিবেশ, সমাজ, শিল্প, শিক্ষার্থীদের বয়স প্রভৃতির প্রতি মনোযোগ দিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণের কথা বলা হয় । এছাড়া বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে তৃণমূলপর্যায়ে শিক্ষার জন্য দায়িত্ব দানের সুপারিশ করা হয়েছে। পরিকল্পনাকালীন সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে এ ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার নীতি ঘোষণা করা হয়। এজন্য "গণ বিদ্যালয়", "যুব ক্যাম্প", "সাক্ষরতা বিদ্যালয়", "মহিলা শিক্ষা কেন্দ্র", "শ্রমিক বিদ্যালয়", "উপানুষ্ঠানিক বৃত্তিমূলক শিক্ষা কেন্দ্র" প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষাদানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতিকে এ লক্ষ্যে ব্যবহারের পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (১৯৭৪)

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। নতুন দেশের জন্য যুগোপযোগী একটি আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ কুদরাত-এ-খুদাকে আহ্বায়ক করে ১৮ জন প্রথিতযশা শিক্ষাবিদের সমন্বয়ে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। "শিক্ষার নানাবিধ অভাব ও ত্রুটি বিচ্যুতি দূরীকরণ, শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশ দান এবং দেশকে আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলীয়ান করার পথ নির্দেশের উদ্দেশ্যেই সরকার এই কমিশন নিয়োগ করে"। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের পর রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসকবর্গ এই রিপোর্টটিকে জনগণের মধ্যে প্রচারিত হতে দেয়নি। রিপোর্টের মূলসুপারিশগুলো নিম্নরূপ:

প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

১. দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সামাজিক রূপান্ত রর হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী, সৃজনশীল ও গবেষণাধর্মী করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

২. বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা এবং ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানের কর্মসূচি নেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। উচ্চতর গবেষণার জন্য বিদেশী ভাষা শিক্ষার লক্ষ্যে একটি আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছে।

৩. দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক শিক্ষার্থীর হার বিজ্ঞানসম্মত পর্যায়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীর হার সর্বোচ্চ ১ঃ৩৫ এবং পোষ্ট গ্রাজুয়েট রিসার্চ পর্যায়ে সর্বনিম্ন ১ঃ৫ করার পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪. পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্য "শিশু ভবন", "শিশু উদ্যান" স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে। একটি শিশু শিক্ষা গবেষণা ইনষ্টিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে শিশু শিক্ষা ও শিশুমনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

৫. প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার নীতি ঘোষণা করা হয়। পরবর্তী সময়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক সার্বজনীন শিক্ষার পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

৬. পাঁচ থেকে তের বছর বয়স পর্যন্ত যেসব শিশু পরিবারের আয়ের জন্য কাজ করে তাদের জন্য পনের বছর বয়স পর্যন্ত নৈশ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

৭. প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কর্মমুখী, বিজ্ঞানভিত্তিক, অভিন্ন পাঠক্রম সম্বলিত শিক্ষা সরকারী ব্যয়ে পরিচালনার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

৮. বালিকাদের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষয়িত্রী অধিকহারে নিয়োগদানের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

৯. প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের জন্য একটি প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী ও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

১. নবম থেকে একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর চালু হবে। নবম শ্রেণি থেকে শিক্ষাকে (১) বৃত্তিমূলক ও (২) সাধারণ শিক্ষায় বিভক্ত করা হবে। নবম ও দশম শ্রেণিতে বৃত্তিমূলকশিক্ষার প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ চালু করতে হবে।
২. মাধ্যমিক স্তর সমাপনকারী স্বল্প সংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চ শিক্ষার প্রস্তুতি স্তর হিসেবে বিবেচিত হবে।
৩. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তিন বছর মেয়াদী বৃত্তিমূলকও চার বছর মেয়াদী সাধারণ শিক্ষার পরিকল্পনা করা হয়।
৪. অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থানীয় ও জাতীয় চাহিদা ভিত্তিতে এক বা একাধিক বিষয়ে বৃত্তিমূলকশিক্ষা প্রবর্তন করা হবে।
৫. অষ্টম শ্রেণি পাস করা শিক্ষার্থীর ২০% কে মাধ্যমিক বৃত্তিমূলকশিক্ষাক্রমে আনা হবে এবং পর্যায়ক্রমে ৫০% শিক্ষার্থীকে এ শিক্ষাক্রমের অধীনে আনা হবে।
৬. পরীক্ষামূলকভাবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিলোপ সাধন করে এক বছর মাধ্যমিক স্তরের সাথে এবং এক বছর ডিগ্রি স্তরের সাথে যোগ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষা

১. মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা শুরু হবে।
২. বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্রমের দশম শ্রেণি সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনানুযায়ী একাদশ শ্রেণিতেও বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করবে।
৩. বৃত্তিমূলক শিক্ষা কারিগরী, শিল্প ভিত্তিক, কৃষি ভিত্তিক, ললিতকলা ভিত্তিক, ব্যবসা-বাণিজ্য ভিত্তিক, এবং অন্যান্য বিষয়ে পদ্র ানের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
৪. ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে নবম ও দশম শ্রেণির সমপর্যায়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর পরিকল্পনা করা হয়েছে।
৫. খন্ডকালীন ও নৈশ শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে বয়স্ক ও স্কুলত্যাগীদের স্থানীয় ও জাতীয় চাহিদার ভিত্তিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হবে।
৬. পরিকল্পনা কমিশনের জনশক্তি বিভাগ দেশের বিভিন্ন শিল্প কারখানা, কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রে চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে কারিগরী শিক্ষায় ভর্তির পরিমাণ নির্ধারণ করবে।
৭. মেধাবী কারিগরী শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি প্রকৌশলে শিক্ষার সুযোগ থাকবে।

মাদ্রাসা ও টোল শিক্ষা

১. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাথে সমন্বয় সাধন করে মাদ্রাসা ও টোল শিক্ষার সংস্কার সাধন করা হবে।
২. নবম শ্রেণি থেকে তিনবছর মেয়াদী বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসেবে ধর্মীয় শিক্ষা চালু করা হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

১. শিক্ষকদের প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রেখে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদের ভিত্তিতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ চালু করার প্রস্তাবকরা হয়।
২. উপর্যুক্ত লক্ষ্যে প্রয়োজনে নৈশ ও খন্ডকালীন কোর্স চালু করা যেতে পারে।
৩. শিক্ষকদের পাঠদানের মানোন্নয়নের জন্য সঞ্জীবনী কোর্স চালু করা হবে।
৪. এমন কিছু শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থাকবে যেগুলো থেকে ব্যাচেলর, মাস্টার্স ও ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদানের অবকাঠামোগত সুবিধা থাকবে।
৫. শিক্ষক প্রশিক্ষণে রেডিও, টেলিভিশনসহ অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করা হবে।
৬. জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দেশের চাহিদা প্রভৃতি বিবেচনা করে মাধ্যমিক শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রমসমূহের পুনর্বিন্যাস করার পরিকল্পনা পেশ করা হয়।
৭. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগ খোলা হবে।

উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা

১. উচ্চ শিক্ষার সংস্কার সাধন করে গবেষণা ও বিশেস্ভষণমুখী, জ্ঞানদক্ষ, দূরদৃষ্টি ও স্বাধীন চিন্তা শক্তি সম্পন্ন জনশক্তি সৃষ্টি করা হবে।
২. সমাজ ও দেশের চাহিদাকে বিশ্লেষণ করে পরিকল্পিতভাবে উচ্চ শিক্ষা সম্প্রসারণে পদক্ষেপ নেয়া হবে।
৩. দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাথে সুসমন্বিত করে শিক্ষিত জনসম্পদের চাহিদা নির্ধারণ করা হবে।
৪. উচ্চ শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও ব্যয় সংকোচনের প্রতি খেয়াল রেখে পেশা ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি চালু করা হবে।
৫. পূর্ণকালীন শিক্ষার পাশাপাশি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে খন্ডকালীন শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা নেয়া হবে।
৬. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে মৌলিক গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।
৭. দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাথে প্রকৌশল শিক্ষার সমন্বয় সাধন করতে হবে। সংখ্যার তুলনায় প্রকৌশল শিক্ষায় শিক্ষাগত মানকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হবে।
৮. দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আলোকে কৃষি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, আইন, ললিতকলা প্রভৃতি শিক্ষার উন্নয়ন সাধন করার পরিকল্পনা পেশ করা হয়।

নারী শিক্ষা

১. নারী শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে যতড়বশীল হতে হবে। নারীদের শিক্ষাক্রম পরিবার ও সমাজের জন্য উপযোগী করে তৈরি করা হবে।
২. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিকার পরিমাণ বাড়ানো হবে।
৩. নারীদের প্রবণতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান করা হবে।

বয়স্ক শিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

১. প্রত্যেক গ্রামের বয়স্কদের জন্য একটি শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হবে। বয়স্ক ব্যক্তিরা এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছয় মাসে শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করবেন।
২. বয়স্কদের নিয়ে গবেষণা, পুস্তক প্রণয়ন প্রভৃতির জন্য বয়স্ক শিক্ষা ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা হবে।
৩. দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে অক্ষর জ্ঞান দান করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি নেয়া হবে। এজন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষিত সমাজ কর্মী, কলকারখানার শিক্ষিত ব্যক্তি, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতির সহযোগিতা নেয়া হবে।
৪. আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সারা দেশে ব্যাপকভাবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান

কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত হলো শিক্ষার উন্নয়ন। তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্থ সংস্থানের জন্য-

১. দেশের মোট জাতীয় আয়ের ৫%-৭% শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করার প্রস্তাবপেশ করা হয়।
২. বরাদ্দকৃত এসকল অর্থের ৬০% প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষার জন্য, ২৫% বৃত্তিমূলক, মাধ্যমিক ও বিশেষ শিক্ষা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য, বাকী ১৫% কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
৩. শিক্ষাখাতে ব্যয়ের প্রায় ৭৫% সরকারী তহবিল থেকে আসে। পরিকল্পনা কমিশনকে শিক্ষার জন্য করের মাত্রা বৃদ্ধি করার এবং শিক্ষাখাতে সরকারী ব্যয় বরাদ্দের অনুপাত জাতীয় আয়ের ৭% থেকে ২৫% এ উন্নীত করার সুপারিশ পেশ করা হয়।
৪. যেসকল পৌরসভার লোকসংখ্যা লক্ষাধিক সে সকল পৌরসভাকে নিজ এলাকার সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করার সুপারিশ করা হয়। অন্যান্য পৌরসভা দুই তৃতীয়াংশ ব্যয় নির্বাহ করবে এবং জেলা পরিষদগুলো ৩৫% ব্যয় বহন করবে।
৫. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যয়ের ৫০% ছাত্রবেতন এবং ৫০% সরকারী ও অন্যান্য উৎস থেকে বহনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।
৬. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বেতন বৃদ্ধির পরিকল্পনা পেশ করা হয়।
৭. শিক্ষা ব্যয় বিশেষত কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যয়ের বৃহদাংশ শিল্প কারখানাসমূহের দ্বারা বহনের প্রস্তাবপেশ করা হয়।

৮. শিক্ষা ব্যয় এবং এর উৎস যেমন কর, ছাত্রবেতন, উন্নয়ন তহবিল, বৈদেশিক সাহায্য প্রভৃতির পরিকল্পনা প্রণয়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি শাখা গঠন করা হবে।

৯. জনসম্পদ সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদী পূর্বানুমান, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী চাহিদার ভিত্তিতে শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণীত হবে।

সমালোচনা

ডঃ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাসে একটি অতি মূল্যবান দলিল হিসেবে বিবেচিত। এতে বাংলাাদেশের শিক্ষার বাস্তব সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ সকল সমস্যার সমাধানে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে দেশ, দেশের অর্থনীতি, চাহিদা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতিকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষায় অর্থ সংস্থানের কথা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ, তা সংগ্রহের সম্ভাব্য নানাবিধ উৎসের সন্ধান দানের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। তবে বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক সাধ্যের তুলনায় সম্ভবত অর্থ সংস্থানের জন্য তাদের উপর একটু বেশি এবং নানামুখী করের প্রস্তাবকরা হয়েছে। কিন্তু একথাও বলা হয়েছে যে, এধরনের ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত অনুন্নত একটি দেশের শিক্ষা পরিকল্পনা ও অর্থনীতিকে সুন্দরভাবে এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। এতে শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে অগ্রসর হওয়ার সুপারিশ যথার্থভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৪

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন (সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।)

১। শিক্ষা বিষয়ে বাংলাদেশের সংবিধানে কোনটির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়?

ক. "মধ্যবিত্তমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা"　　খ. "সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক"

গ. "এলিট শ্রেণির জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা"　　ঘ. উচ্চ বিত্ত শ্রেণির প্রয়োজনীয় শিক্ষা।

২। প্রথম পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ মোট বিনিয়োগের-

ক. শতকরা পাঁচ ভাগ　খ. শতকরা ছয় ভাগ　গ. শতকরা সাত ভাগ　ঘ. শতকরা সাত দশমিক পাঁচ ভাগ।

৩। কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনে শিক্ষার জন্য জাতীয় আয়ের কত শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়?

ক. ৫%-৭%　খ. ৭%-৯%　গ. ৩%-৫%　ঘ. ৫%-৬%

সঠিক উত্তরঃ ক) ১। খ ২। গ ৩। ক

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন নারী শিক্ষা সম্পর্কে কি সুপারিশ করে?

২. বয়স্ক শিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পর্কে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশগুলো লিখুন।

৩. সংক্ষেপে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের একটি সমালোচনা লিখুন।

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক শিক্ষা পরিকল্পনার প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্যাবলি ও কৌশলগুলো আলোচনা করুন।

২. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক, প্রাক-প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে যেসব সুপারিশ করেছে তার বিবরণ দিন।

৩. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন শিক্ষক প্রশিক্ষণ, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য যেসব সুপারিশ পেশ করেছে তা বিবৃত করুন।

৪. শিক্ষার অর্থ সংস্থানের জন্য এবং বৃত্তিমূলকও কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

পাঠ ৬.৫ : শিক্ষা পরিকল্পনা ও শামসুল হক শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা, গণশিক্ষা এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য শামসুল হক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ উল্লেখ করতে পারবেন;
- মাধ্যমিক, বৃত্তিমূলক ও মাদ্রাসা শিক্ষার সুপারিশগুলো বিবৃত করতে পারবেন;
- উচ্চ শিক্ষার পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্পর্কে শামসুল হক কমিশনের প্রস্তাবসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষায় বর্তমান অর্থায়ন, অর্থায়নের উৎস এবং ভবিষ্যত অর্থায়ন পরিকল্পনা বলতে পারবেন।

১৯৭৪ সালের কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের পর বাংলাদেশে ১৯৭৯ সালে একটি অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি ও ১৯৮৮ সালে মফিজুদ্দিন শিক্ষা কমিশন শিক্ষা পরিকল্পনা ও উন্নয়নের জন্য সুপারিশ পেশ করে। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি এবং মফিজুদ্দিন কমিশন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পরিকল্পনাবিদদের মাঝে তেমন আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি।

উপরন্তু শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক সংগঠন প্রভৃতির প্রতিবাদের মুখে অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি এবং মফিজুদ্দিন শিক্ষা কমিশনের কাজ অগ্রসর হতে পারেনি। এমনি পরিস্থিতিতে ১৯৯৭ সালে শামসুল হক শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এ কমিশন কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশগুলো অধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এবং অন্যান্য কমিশনের সুপারিশগুলো পর্যালোচনা করে একটা যুগোপযোগী, বিজ্ঞান মনস্ক ও প্রগতিশীল শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। এতে রয়েছে বাংলাদেশের শিক্ষার পুনর্গঠন ও পরিকল্পনা সম্পর্কে বিভিন্ন সুপারিশ। নিম্নে সুপারিশগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

প্রাথমিক শিক্ষা

১. ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পর্যায়ক্রমে আট বছর করা এবং এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা।
২. দেশের প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়।
৩. প্রাথমিক শিক্ষার নানামুখী ধারায় বিদ্যমান বৈষম্য কমিয়ে এনে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা নেওয়া।
৪. প্রাথমিক স্তরের শেষ তিন শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের জীবন ও পরিবেশের উপযোগী কিছু বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করার সুপারিশ এতে করা হয়।
৫. প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ঃ৩৫ করার সুপারিশ করা হয়।
৬. প্রথম শ্রেণির প্রথম ছয় মাসের শিক্ষাকে প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়।
৭. নিম্ন প্রাথমিকের (প্রথম-পঞ্চম শ্রেণি) শিক্ষক নিয়োগে সর্বনিম্ন যোগ্যতা হবে একটি দ্বিতীয় বিভাগসহ এইচএসসি পাশ মহিলা এবং উচ্চ প্রাথমিকের (ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি) জন্য একটি দ্বিতীয় বিভাগসহ স্নাতক ডিগ্রিধারী মহিলা বা পুরুষ। প্রধান শিক্ষকের সরাসরি নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগের স্নাতক এবং তিন বছরের মধ্যে সিইনএড বা বিএড, (প্রাইমারী) ডিগ্রি অর্জন করা।
৮. শিক্ষকদের উচ্চতর ডিগ্রি ও প্রশিক্ষণের সাথে পদোন্নতির যোগসূত্র স্থাপন।
৯. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন একাডেমীকে প্রাথমিক শিক্ষা গবেষণা, অগ্রগতি ও বিকাশে সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।
১০. দুই হাজার সাল নাগাদ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দেশজ আয়ের শতকরা তিনভাগ বরাদ্দ করার সুপারিশ করা হয়।

গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

১. গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে ২০০৫ সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার অন্তত ৯০ শতাংশে উন্নীত করা।
২. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে না পারা শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা শেষে ৮-১৪ বছর বয়সের শিশুকিশোররা ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবে।

৩. বয়স্কদের সাক্ষরতা, সচেতনতা ও পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষাদান করা হবে।
৪. সাক্ষরতার মাধ্যমে অর্জিত ফলাফলকে ধরে রাখার জন্য গ্রামগুলোতে লোককেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করা হবে।
৫. স্বল্প সময়ে সাক্ষরতা কর্মসূচির সাহায্যে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জনের জন্য বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটির মাধ্যমে ব্যাপক ও সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।
৬. ২০০৫ সালের মধ্যে সাক্ষরতার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে বেতার ও টেলিভিশনের মাধ্যমে কর্মসূচি পরিচালনার পরিকল্পনা নেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

১. নবম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করার এবং এ শিক্ষার তিনটি ধারায় সাধারণ, মাদ্রাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম অনুসরণের পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।
২. মাধ্যমিক শিক্ষার অভিন্ন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্য পুস্তক জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রণয়ন করবে। বৃত্তিমূলক ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিশেষ পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক যথাক্রমে কারিগরী এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রণয়ন করবে।
৩. উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে নবম ও দশম শ্রেণি এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি খোলার সুপারিশ করা হয়।
৪. বিষয়ানুযায়ী শিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের দ্বারা খালি পদ পূরণ, প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
৫. দশম শ্রেণির পর প্রথম পর্ব মাধ্যমিক এবং দ্বাদশ শ্রেণির পর দ্বিতীয় পর্ব মাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। উভয় ক্ষেত্রে আন্তঃপরীক্ষার ফলাফল সমন্বয়ের মাধ্যমে এবং গ্রেডিং পদ্ধতিতে মুল্যায়ন করে চূড়ান্ত ফল নির্ধারিত হবে।
৬. মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ঃ৪০ করার সুপারিশ করা হয়।
৭. যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বেতন, চাঁদা প্রভৃতি থেকে যথেষ্ট আয়ের সুযোগ আছে সে সকল প্রতিষ্ঠানকে সরকারী বরাদ্দ প্রদান না করার সুপারিশ পেশ করা হয়। তবে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির ক্ষেত্রে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারী নীতিমালা মেনে চলতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

১. জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে।
২. বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাস করে ইবতেদায়ি আট বছর, দাখিল দুই বছর, আলিম দুই বছর, ফাযিল তিন/চার বছর, কামিল দুই/এক বছর মেয়াদী করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
৩. নারীদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।
৪. মাদ্রাসা শিক্ষায় উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করা এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য গাজীপুরের ন্যায় দেশের অন্যান্য স্থানে মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিতে হবে।
৫. দেশের ভিতরে ও বিদেশে নিয়োগ লাভের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের জন্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলকশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা নিতে হবে।
৬. মাদ্রাসাসমূহের সংস্কার, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষা উপকরণ ও পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ প্রভৃতি নিশ্চিত করার পরিকল্পনা নিতে হবে।
৭. মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে ইহার সর্বস্তরে একাডেমিক পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চ পর্যায় ও সাধারণ শিক্ষার মানের সমতা বিধানের দায়িত্ব দিতে হবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

১. দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির জন্য মাধ্যমিক স্তর (মাদ্রাসাসহ), শিল্প কারখানা ও বৃত্তিমূলকশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে স্যান্ডুইচ প্রোগ্রামের মাধ্যমে মাস্টার ক্রাফটসম্যান সৃষ্টির পরিকল্পনা নিতে হবে।
২. ক্রেডিট সমন্বয়ের মাধ্যমে ডিপ্লোমা সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীকে উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে।
৩. ডিপ্লোমা স্তরে তিন বছর ছয়মাস কারিগরী শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক এবং ছয়মাস কারখানায় বা মাঠ পর্যায়ে সংযুক্তির পরিকল্পনা নিতে হবে।

৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য দুই শিফট চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
৫. কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনীয় পুস্তক রচনা ও অনুবাদের পরিকল্পনা নিতে হবে।

উচ্চ শিক্ষা

১. মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনকারী শিক্ষার্থীগণ মেধা, আগ্রহ ও প্রবণতার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবে।
২. উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
৩. বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছরের সমন্বিত ডিগ্রি কোর্স ও এক বছরের মাস্টারস কোর্স এবং সাধারণ কলেজগুলোতে তিন বছরের সমন্বিত ডিগ্রি কোর্স পড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। চার বছরের ডিগ্রি কোর্স এবং এক ও দুই বছরের মাস্টার্স কোর্স বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পড়ানো হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অভিন্ন ও এক ধরনের পাঠ্যসূচি থাকবে।
৪. বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণ এমফিল কোর্স দু'বছরের হবে। সর্বমোট তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে পিএইচডি কোর্স শেষ করার পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।
৫. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষক ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক গবেষণা ও ফেলোশিপের ব্যবস্থা রাখার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। ডিগ্রি কলেজগুলোতেও গবেষণার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
৬. শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ রচনাসমূহ বাংলা ভাষায় ভাষান্তর করাকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।
৭. উচ্চ শিক্ষার আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার জন্য সরকারী অনুদান, শিক্ষার্থীর বেতন, ব্যাংক ঋণ বা ব্যক্তিগত অনুদানের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। অভিভাবকের আর্থিক সচ্ছলতার প্রত্যয়নপত্রের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বেতন নির্ধারণ করলে দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।
৮. প্রয়োজনবোধে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শাখা খোলার অনুমতিদানের সুপারিশ করা হয়েছে।
৯. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও শিক্ষার মান সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমান করা। টেলিভিশনের দ্বিতীয় চ্যানেলে অধিকতর সময় বরাদ্দ, রেডিও ট্রান্সমিশন, মাল্টি ইনফরমেশন সিস্টেম, ইন্টারনেট সিস্টেম প্রভৃতির সাহায্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করার পরিকল্পনা নিতে হবে।
১০. বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, শিক্ষকদের যোগ্যতা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমানের করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
১১. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নত করা, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নেরসমন্বয় সাধন ও নেতৃত্ব দান করবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

শিক্ষায় অর্থায়ন

শিক্ষায় বিনিয়োগ ও তার সাথে সামাজিক চাহিদার ইতিবাচক সম্পর্ক নিয়ে এখন সমাজবিজ্ঞানী, পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে দ্বিমত নেই। ১৯৭৪ সালে কুদরাত-এ-খুদা কমিশন জাতীয় আয়ের শতকরা ৫% শিক্ষাখাতে ব্যয় করার সুপারিশ করেছিল এবং অল্প সময়ের মধ্যে তা ৭%-এ উন্নীত করার পরিকল্পনা পেশ করেছিল। কিন্তু দীর্ঘ প্রায় ২৫ বছর সময়ে তা করা সম্ভব হয়নি। এমনকি ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত ইউএনডিপি-র মানব সম্পদউন্নয়ন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ১৯৯৩-৯৬ কাল পর্বে বাংলাদেশে জাতীয় আয়ের ২.৯% শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়েছে। একই সময়ে মালদ্বীপে জাতীয় আয়ের ৬.৪%, শ্রীলংকায় ৩.৪%, ভারতে ৩.৪%, নেপালে ৩.১% এবং পাকিস্তানে ৩.০% শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়েছিল। অর্থাৎ প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় শিক্ষাখাতে জাতীয় আয় বরাদ্দের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষার জন্য অর্থ ও সম্পদআসে মূলত সরকার থেকে। এছাড়া বেসরকারী গোষ্ঠী, ব্যক্তিগত উদ্যোগ, বেসরকারী ও বিদেশী সংস্থা থেকেও আসে। মোট শিক্ষা ব্যয়ের ৭০/৮০ ভাগ সরকারী তহবিল থেকে আসে এবং বাকি ৩০/২০ ভাগ অন্যান্য উৎস থেকে আসে। বাংলাদেশে শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নতকরণে বিপুল পরিমাণে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে। ছাত্র বেতনের মাধ্যমে এ খরচ মিটানো সম্ভব নয়। এশিয়ার প্রায় অর্ধেক দেশেই ছাত্র বেতন থেকে উচ্চ শিক্ষার মাত্র ১০% ব্যয়ের যোগান দেওয়া সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে কমিশন মনে করে যে, শিক্ষাখাতে ক্রমবর্ধমান সম্পদের চাহিদা মেটানো হবে- (ক) অতিরিক্ত জাতীয় বরাদ্দের মাধ্যমে, (খ) অপচয় রোধ ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন করে, (গ) প্রতিষ্ঠানের আয় বাড়িয়ে, (ঘ) সুশীল সমাজের উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত অনুদানের মাধ্যমে, (ঙ) বিদেশী সাহায্য ও স্থানীয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

শিক্ষায় অর্থায়নে কমিশন নিম্নোক্ত পরিকল্পনা গ্রহণের সুপারিশ করে-

১. ২০০০ সাল নাগাদ শিক্ষাখাতে জাতীয় আয়ের বরাদ্দ ৫% এ উন্নীত করা এবং ২০১০ সাল নাগাদ তা ৭%এ উন্নীত করা।

২. বিত্তবানদের আয়ের উপর শিক্ষা কর প্রর্বতন করে শিক্ষাখাতের জন্য অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করা। এই কর ইউনিয়ন পর্যায় থেকে জেলা পর্যায়ে এবং পৌর এলাকায় স্থানীয় সরকার সংস্থা আদায় করে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করার পরিকল্পনা নেয়ার সুপারিশ করা হয়।

৩. ছাত্র বেতন বৃদ্ধির জন্য একটি ফর্মুলা তৈরি করতে হবে। ছাত্রবেতন বৃদ্ধি করা হলে এর সঙ্গে ব্যাংক ঋণ ও বৃত্তি প্রদানের সঙ্গতিপূর্ণ মাত্রা প্রবর্তন করতে হবে।

৪. বেসরকারী পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষা প্রসারে উৎসাহ দেয়া হবে। বেসরকারী শিক্ষা অনুদান আয়কর মুক্ত হবে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার যথোপযুক্ত মান রক্ষা করতে হবে।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ একত্রিত করে প্রারম্ভিক মূলধন হিসেবে ব্যবহার করে একটি শিক্ষা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তা থেকে ঋণ দেয়ার পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

(সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।)

১। ইউ এন ডি পি'র মানব সম্পদরিপোর্ট মোতাবেক ১৯৯৩-৯৬ সময়ে দেশের জাতীয় আয়ের কত শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয়িত হয়েছে?

ক. ২.৯% খ. ৩.১% গ. ৩.৪% ঘ. ৬.৪%।

২। প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় শিক্ষাখাতে জাতীয় আয় বরাদ্দের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান-

ক. সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে খ. সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে গ. দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ঘ. তৃতীয় স্থানে রয়েছে

৩। শামসুল হক শিক্ষা কমিশন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টেলিভিশনের জাতীয় চ্যানেলে

ক. সময় বরাদ্দ না করার সুপারিশ করেছে খ. স্বল্প সময় বরাদ্দের সুপারিশ করেছে

গ. অধিক সময় বরাদ্দের সুপারিশ করেছে ঘ. বরাদ্দকৃত সময় কমিয়ে আনার সুপারিশ করেছে।

৪। শামসুল হক শিক্ষা কমিশন ছাত্র বেতন

ক. বিলোপ করার প্রস্তাবকরেছে খ. ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করেছে

গ. নিম্নতম পর্যায়ে রাখার প্রস্তাব করেছে ঘ. বৃদ্ধির জন্য একটি ফর্মুলা তৈরির প্রস্তাব করেছে।

সঠিক উত্তর: ক) ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কোন্ প্রেক্ষাপটে শামসুল হক শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় বর্ণনা করুন।

২. শামসুল হক শিক্ষা কমিশনের বৃত্তিমূলকশিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশগুলো লিখুন।

৩. শিক্ষাখাতে সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে শামসুল হক শিক্ষা কমিশন কি কি উৎস চিহ্নিত করেছে?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. শামসুল হক শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক, উপানুষ্ঠানিক ও গণশিক্ষা সম্পর্কে যে সুপারিশ পেশ করেছে তার বিবরণ দিন।

২. শামসুল হক শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশগুলো উল্লেখপূর্বক এগুলোর কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করুন।

৩. শামসুল হক শিক্ষা কমিশনের উচ্চশিক্ষা ও শিক্ষার অর্থায়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করুন।

৪. শামসুল হক শিক্ষা কমিশনের একটি পর্যালোচনা প্রবন্ধ লিখুন।

পাঠ ৬.৬ : শিক্ষা পরিকল্পনা ও জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর সুপারিশ উল্লেখ করতে পারবেন;
- মাধ্যমিক, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা এবং মাদ্‌রাসা শিক্ষার সুপারিশগুলো বিবৃত করতে পারবেন;
- উচ্চ শিক্ষার পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর প্রস্তাবসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সুপারিশগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০'-এর পূর্বে স্বাধীন বাংলাদেশে আরো ছয়টি কমিশন/কমিটি রিপোর্ট ঘোষিত হয়েছিল। এগুলো হলো: বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (ড. কুদরত-ই-খুদা) রিপোর্ট ১৯৭৪, অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি (কাজী জাফর-আবদুল বাতেন প্রণীত) ১৯৭৯, মজিদ খান কমিশন রিপোর্ট ১৯৮৩, মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৮৭, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ ও জাতীয় শিক্ষা কমিশন (মনিরুজ্জামান মিয়া) প্রতিবেদন ২০০৩। সেই মোতাবেক বাংলাদেশে 'জাতীয় শিক্ষানীতি' হয়েছে দুটি ২০০০ ও ২০১০ সালে। বর্তমান শিক্ষানীতি- ২০১০ জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী (চেয়ারম্যান) ও ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ (কো-চেয়ারম্যান) এর নেতৃত্বাধীন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রণীত হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ পরিশিষ্ট বাদে ২৮টি অধ্যায় উপস্থাপন করা হয়।

১৯৭৪ সালে প্রণীত ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের আলোকে বর্তমান সরকার সবর্জন গৃহীত একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রয়াস পায়। যার ধারাবাহিকতায় ২০১০ সালে বাংলাদেশ সরকার সর্বজন গৃহীত 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' জাতীয় সংসদ কর্তৃক স্বীকৃতি দান এবং দেশ ও জনগণের জন্য তা বাস্তবায়নের প্রয়াস পান। এতে রয়েছে বাংলাদেশের শিক্ষার পুনর্গঠন ও পরিকল্পনা সম্পর্কে বিভিন্ন সুপারিশ। নিম্নে সুপারিশগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

প্রাথমিক শিক্ষা

- প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে আট বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারন করা হবে। এটি বাস্তবায়নে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অবকাঠামোগত আবশ্যকতা মেটানো এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা।
- ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করার জন্য অনতিবিলম্বে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:
  - ✓ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার নতুন শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা;
  - ✓ প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষাক্রম বিস্তারসহ শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ওপর ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
  - ✓ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার এই পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হবে। যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে আট বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ২০১৮-এর মধ্যে ছেলে-মেয়ে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জাতিসত্তা নির্বিশেষে পর্যায়ক্রমে সারা দেশের সকল শিশুর জন্য নিশ্চিত করা হবে।
- বর্তমানে চালু ৬^+ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির নিয়ম বাধ্যতামূলক করা হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ঃ৩০। এ লক্ষ্য পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে অর্জন করা হবে।

- দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্য উপবৃত্তি সম্প্রসারণ করা হবে।
- স্কুলের পরিবেশ আকর্ষণীয় ও আনন্দময় করে তোলা হবে। এই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য খেলাধুলার সুব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের আগ্রহ, মমত্ববোধ ও সহানুভূতিশীল আচরণ এবং পরিচ্ছন্ন ভৌত পরিবেশসহ উল্লেখযোগ্য উপকরণের উন্নয়ন ঘটানো হবে। ছেলে-মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্পন্ন পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করা হবে। শারীরিক শাস্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হবে।
- দুপুরের খাবার ব্যবস্থা করা জরুরি। পিছিয়ে পড়া এলাকাসহ গ্রামীণ সকল বিদ্যালয়ে দুপুরে খাবার ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে চালু করা হবে।
- পাহাড়ি এলাকায় এবং দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ে হোস্টেলের ব্যবস্থা করার দিকে নজর দেওয়া হবে।
- মেয়ে শিশুদের মধ্যে ঝরে পড়ার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে অধিক হওয়ায় তারা যাতে ঝরে না পড়ে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। মেয়ে শিক্ষার্থীরা যেন বিদ্যালয়ে কোনোভাবে উত্যক্ত না হয় তা নিশ্চিত করা হবে।
- বর্তমানে পঞ্চম শ্রেণি শেষ করার আগে প্রায় অর্ধেক এবং যারা পরবর্তী পর্যায়ে যায় তাদের প্রায় ৪০ শতাংশ দশম শ্রেণি শেষ করার আগে ঝরে পড়ে। ঝরে পড়া দ্রুত কমিয়ে আনা জরুরি। ২০১৮ সালের মধ্যে সকল শিক্ষার্থী যেন অষ্টম শ্রেণি শেষ করে সেই লক্ষ্যে উপর্যুক্ত পদক্ষেপগুলোসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দ্রুত গ্রহণ করা হবে।

বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

- বয়স্ক শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে সাক্ষর, লেখা-পড়া ও হিসাব-নিকাশে ন্যূনতমভাবে দক্ষ, মানবিক গুণাবলির চেতনায় উদ্দীপ্ত, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতন এবং পেশাগত দক্ষতায় উন্নত করে তোলা। প্রাথমিক পর্যায়ে ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত এবং প্রাপ্ত বয়স্ক সকলকে সাক্ষর করে না তোলা পর্যন্ত বয়স্ক শিক্ষার এই ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হবে।
- বয়স্ক শিক্ষার আওতায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে সাক্ষরতা শিক্ষা, মানবিক গুণাবলির বিকাশ, সচেতনতা অর্জন ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন।
- দেশের সকল নিরক্ষর নারী-পুরুষের জন্য এই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। তবে নিরক্ষরদের মধ্যে যাদের বয়স পনের থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর এক্ষেত্রে তারা অগ্রাধিকার পাবে।
- বয়স্ক শিক্ষার জন্য শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। বয়স্ক সাক্ষরতা কোর্স ব্যতিত অন্যান্য কোর্সের সময়সীমা, বিষয়বস্তু, পঠন-পাঠনের পদ্ধতি, শিক্ষকের যোগ্যতা ও শিক্ষণ-প্রক্রিয়া, স্থানীয় ও প্রবাসী জনমানুষের চাহিদা, সম্পদের প্রাপ্যতা ও পেশাগোষ্ঠীর প্রকৃতি অনুসারে নির্ধারিত হবে। জাতীয় গণশিক্ষার শিক্ষাক্রম-বিষয়ক কমিটি প্রয়োজনে শিক্ষার অন্যান্য ধারার যেমন- বৃত্তিমূলক ও কারিগরি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ, কৃষি, বন ও পরিবেশ, মৎস্য ও পশুপালন ইত্যাদির সঙ্গে সমন্বয় রেখে এবং বিদেশে দক্ষ শ্রমিক প্রেরণের বিষয়টি বিবেচনা করে উপযুক্ত বিষয়াদির শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হবে।
- অর্জিত শিক্ষা ও দক্ষতাকে অটুট রাখার জন্য অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। গ্রামে পাঠঅনুশীলন- চক্র ও গ্রামশিক্ষা-মিলনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।
- সমন্বিত সাক্ষরতা অভিযানে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজ বিভিন্ন পদ্ধতি, উপকরণ, প্রক্রিয়া ও অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সমন্বয় ঘটিয়ে যথাসম্ভব কম সময়ে দেশ থেকে নিরক্ষতা দূর করার চেষ্টা করা হবে। বিভিন্ন ধরনের বাস্তব উদ্যোগ উৎসাহিত করা হবে এবং মূল্যায়ন সাপেক্ষে যে উদ্যোগ বিশেষভাবে কার্যকর প্রতীয়মান হবে সেটিকে জোরদার করার লক্ষ্যে সহায়তা দেওয়া হবে। এই লক্ষ্যে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হবে।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তি হওয়ার বয়স আট বছর থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার উপকরণ প্রণীত হবে।
- উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার উপকরণে জাতীয় চাহিদার প্রতিফলন থাকবে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা যায় এমন উপকরণ দ্বারাই উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

- মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে তিনটি ধারা থাকবে সাধারণ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষাধারা এবং প্রত্যেক ধারা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত থাকবে। সব ধারাতেই জন-সমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে যথা- বাংলা, ইংরেজি, বাংলাদেশ স্টাডিজ, সাধারণ গণিত ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষায় অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক থাকবে। প্রত্যেক ধারায় এসকল বিষয়ে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। অবশ্য প্রত্যেক ধারায় সেই ধারা-সংশ্লিষ্ট আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক বিভিন্ন বিষয় থাকবে।
- ধারাসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ধারার শিক্ষায় উৎকর্ষ অর্জনের প্রয়োজন-ভিত্তিক বিন্যাস এবং সেই অনুসারে স্ব স্ব শিক্ষাক্রম তৈরি করা হবে।
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে। উক্ত কমিটি সকল ধারার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে।
- মাধ্যমিক স্তরে মাদরাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ বিষয়সমূহ ব্যতীত সকল ধারার জন্য অভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং সাধারণ ধারার বিশেষ বিষয়সমূহের প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। মাদরাসা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ বিষয়সমূহের পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে যথাক্রমে বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড।
- বর্তমান উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি সংযোজন করা হবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে নবম ও দশম শ্রেণি খোলার ব্যবস্থা করা হবে। এই লক্ষ্যে বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণি কক্ষ ও বিভিন্ন আসবাবপত্র ও শিক্ষা-সরঞ্জাম বৃদ্ধি করা হবে। উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে উচ্চতর শ্রেণিসমূহে পাঠদানের জন্য ইংরেজিসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।
- সুষ্ঠু পাঠদানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা-উপকরণের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হবে। খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হবে। গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগারিক পদ সৃষ্টি করে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হবে।
- অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে অধিক সম্পর্কিত সামাজিক বিজ্ঞান ও ব্যবসায়-শিক্ষা শাখার বিষয়সমূহ (যেমন- অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবসায়-শিক্ষা), কারিগরি শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি কম্পিউটার এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়গুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত সরকারি সহায়তা (যেমন- শিক্ষকের বেতন-ভাতা, বিজ্ঞানশিক্ষার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ইত্যাদি) প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে ১ঃ৩০-এ উন্নীত করা হবে।
- সরকারি কর্মকমিশনের অনুরূপ প্রস্তাবিত বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন প্রতি বছর যথাযথ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ধারার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নির্বাচন করবে এবং তাঁদের মধ্য থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ করবে।
- সকল বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণকে অনতিবিলম্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য কাজে যোগদানের আগে মৌলিক শিক্ষকতা-প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। শূন্যপদ পূরণের সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা

- দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের সকল ধারায় প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাক্রম চালু করা হবে। প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীকে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাসহ আট বছর মেয়াদি শিক্ষা অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে।
- অষ্টম শ্রেণি সমাপ্ত করার পর অর্থাৎ প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ একজন শিক্ষার্থী বৃত্তিমূলক/কারিগরি শিক্ষা ধারায় ভর্তি হতে পারবে। এই ধারায় যারা যাবে তারা যেন ধাপে ধাপে তাদের নির্বাচিত কারিগরি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে ।

- বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ঃ১২।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সকল শিক্ষাক্রমে যথাযথ দক্ষতা অর্জনের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সকল স্তরের শিক্ষাক্রমে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- ১৯৬২ সালের শিক্ষানবিশি আইনকে যুগোপযোগী করে দেশে ব্যাপক ভিত্তিতে শিক্ষানবিশ (অ্যাপ্রেনটিসশিপ) কার্যক্রমের প্রবর্তন করা হবে।
- প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে।
- সর্বস্তরের সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিল্প কারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সকল বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ভিটিটিআই ও টিটিটিসি-র আসন এবং প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা হবে।
- বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার জন্য বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত মানসম্মত পুস্তক প্রণয়ন, অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হবে।
- বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। এছাড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, লেদার ইনস্টিটিউটসহ এ ধরনের অন্যান্য ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।
- মাধ্যমিক স্কুল/বৃত্তিমূলক কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদিতে কারিগরি শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সুসংহত করার জন্য দেশের সমস্ত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হবে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডকে অধিকতর শক্তিশালী করা হবে এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান ও জনবলের ব্যবস্থা করা হবে।
- নতুন নতুন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এবং সেগুলোর ব্যবস্থাপনা পর্যায়ক্রমে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ব্যবস্থা অনুসরণ করা হবে। তবে এগুলোতে অস্বচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়েদের স্বল্প ব্যয়ে পড়ার সুযোগ থাকবে।
- ভবিষ্যতে কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা

- বর্তমানে মাদ্‌রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা বজায় রেখে একে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতে এ শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়।
- বর্তমানে বাংলাদেশে ইবতেদায়ি পাঁচ বছর, দাখিল পাঁচ বছর, আলিম দুই বছর, ফাযিল দুই বছর ও কামিল দুই বছর মেয়াদি ব্যবস্থা রূপে প্রচলিত আছে। সব ধরনের মাদরাসার পুনর্বিন্যাস করে অন্যান্য ধারার সঙ্গে সমতা রক্ষার লক্ষ্যে ইবতেদায়ি আট বছর , দাখিল দুই এবং আলিম দুই বছর করা হবে।
- সাধারণ ধারায় উচ্চশিক্ষার সাথে সমন্বয় রেখে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক ও অন্যান্য উপকরণ নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে ৪ (চার) বছর মেয়াদি ফাজিল অনার্স এবং এক বছর মেয়াদি কামিল কোর্স চালু করা হবে। তবে যতদিন পর্যন্ত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক ও অন্যান্য উপকরণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না ততদিন পর্যন্ত ফাযিল ও কামিল কোর্সের বর্তমান মেয়াদ অব্যাহত থাকবে।
- সাধারণ শিক্ষার মতো মাদ্‌রাসা শিক্ষার শিক্ষকদের বেতন-ভাতা কাঠামো নির্ধারণ করা হবে এবং তাদের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ সমভাবে উন্মুক্ত রাখা হবে। এই উদ্দেশ্যে গাজীপুরে স্থাপিত বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রশিক্ষণের সুযোগ আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

- কওমি মাদরাসার ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি কওমি মাদ্‌রাসা শিক্ষা কমিশন'করে, উক্ত কমিশন কওমি প্রক্রিয়ায় ইসলাম শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষাদান বিষয়ে সুপারিশ তৈরি করে সরকারের বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবে।
- মাদরাসাগুলোতে পর্যায়ক্রমে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার মতো শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ সাপেক্ষে বিজ্ঞানাগার স্থাপন এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় সুবিধাদির সৃষ্টি করা হবে।
- সাধারণ শিক্ষার মতো মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার, শিক্ষা উপকরণ, বৃত্তিদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে এবং খেলাধুলার সরঞ্জাম ও সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হবে।
- সাধারণ শিক্ষা ধারায় অনুসৃত শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া মাদ্‌রাসা শিক্ষা ধারায় অনুসরণ করা হবে।
- মাদ্‌রাসা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই শিক্ষার সকল স্তরে সুচারুরূপে পরিচালনা ও তদারকির জন্য সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিতরূপে পরিবীক্ষণ ও অ্যাকাডেমিক পরিদর্শনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- মাদ্‌রাসা শিক্ষার উচ্চ অর্থাৎ ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পাঠদান করা হবে।
- মাদ্‌রাসা শিক্ষার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য একটি অনুমোদনকারী (অ্যাফিলিয়েটিং) ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে।

উচ্চশিক্ষা

- বিভিন্ন ধারার মাধ্যমিক শিক্ষা সফলভাবে সমাপ্ত করার পর মেধা, আগ্রহ ও প্রবণতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করবে।
- মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং আদিবাসীসহ ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, বিভিন্ন কারণে অনগ্রসর এবং অন্যান্য গোষ্ঠির সন্তানদেরকে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আবাসিক সুবিধাসৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ ও বৃত্তি প্রদানসহ বিশেষ সহায়তা দেওয়া হবে।
- শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে পারে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে (যেমন- কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে) উচ্চশিক্ষা প্রদান করা হবে। কোটা পদ্ধতি বা অন্য কারণে ন্যূনতম যোগ্যতার শর্ত শিথিল করা হবে না।
- উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বপ্রকার যতড়বড়ব নেওয়া প্রয়োজন। তারজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- চার বছরের সম্মান সড়বাতক ডিগ্রিকে সমাপনী ডিগ্রি হিসেবে এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষকতা ব্যতীত অন্য সকল কর্মক্ষেত্রে যোগদানের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।
- যে সকল কলেজে তিন বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি কোর্স চালু আছে পর্যায়ক্রমে সেখানে চার বছরের সড়বাতক সম্মান ডিগ্রি কোর্স চালু করা হবে।
- গবেষণা নিশ্চিত করার জন্যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগে পর্যায়ক্রমে গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম চালু করে সেখানে নিয়মিতভাবে মাস্টার্স, এম.ফিল ও পি.এইচ.ডি ডিগ্রি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন যে সকল কলেজে স্নাতকোত্তর শ্রেণি চালু আছে, সেসকল কলেজে এ শ্রেণি অব্যাহত থাকবে। তবে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য তাদের গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানাগার ও অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে এবং শিক্ষকদের মান উন্নয়নে ব্যাপক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যে সকল কলেজে চার বছরের ডিগ্রি অনার্স কোর্স চালু করা হবে, প্রয়োজনে সেগুলোতেও এই বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে সকল ডিগ্রি কোর্স পর্যায়ে ১০০ নম্বরের/৩ ক্রেডিট ইংরেজি বিষয় সকল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক হবে।
- উচ্চশিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি হবে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের। উচ্চশিক্ষায় বাংলায় সম্প্রসারিত ও সমৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষায় রচিত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যবহারযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ রচনা বাংলা ভাষায় অনুদিত হওয়া প্রয়োজন। এই কাজকে জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- শিক্ষার্থীর মেধা ও অভিভাবকের আর্থিক সচ্ছলতার নিরিখে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃত্তি প্রদান করা হবে। তাছাড়া মেধাবী শিক্ষার্থীরা মেধার ভিত্তিতে সহজ শর্তে যেন ব্যাংক ঋণ পেতে পারে সে ব্যবস্থা করা হবে।

- বাংলাদেশের বিকাশমান অর্থনীতিতে পাট, বস্ত্র ও চামড়া খাতের বিপুল গুরুত্ব ও সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় রেখে পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট, টেক্সটাইল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ অব লেদার টেক্নোলজিকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
- শিক্ষকদের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি। এলক্ষ্যে ছুটির সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকদের সমন্বয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ-সেমিনারের ব্যবস্থা করা হবে।
- উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণায় উৎসাহিত করা এবং প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কনসালটেন্সির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
- উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য টেলিভিশনে সুবিধাজনক কোনো চ্যানেলে– যেমন, বিটিভিতে দ্বিতীয় চ্যানেলে–অধিকতর সময় বরাদ্দ, রেডিও ট্রান্সমিশন এবং মাল্টি ইনফরমেশন সিস্টেম চালু করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

- নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য দুই মাসের বুনিয়াদী ও কলেজ শিক্ষকদের জন্য চারমাসের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করা হবে।
- শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির আধুনিকীকরণ করা হবে।
- প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রম সি-ইন-এড পরিবর্তন করে নতুন কার্যক্রম প্রবর্তন করা হবে। এ কার্যক্রমের মেয়াদ এক বছর থেকে বৃদ্ধি করে ১৮ মাস করা হবে।
- শিক্ষা প্রশাসনে যোগ্য ও আত্মবিশ্বাসী কর্মকর্তা সৃষ্টির জন্য চাকুরীর মধ্য ও উচ্চ স্তরে ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।
- বেসরকারি বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকবৃন্দকেও বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এইচএসটিটিআই-তে বর্তমানে চলমান বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ জোরদার করা হবে।
- দেশের সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মান সমপর্যায়ে উন্নীত করা এবং সেগুলোতে যথাযথ পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান সমূহের নিজস্ব কর্মকর্তাদের সমপর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বদলীর ব্যবস্থা করা হবে।
- প্রশিক্ষকদের মানোন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষদের জন্যও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা হবে।
- প্রশিক্ষণে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের ব্যাপক ব্যবস্থা করা ও প্রশিক্ষণার্থীদের ভূমিকার উপযুক্ত মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উৎসাহিত করা হবে।
- প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণকালীন আর্থিক মঞ্জুরি বাড়ানো এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো বস্তুনিষ্ঠ ও কার্যকর এবং সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণের স্বার্থে নিম্নমানের বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে নিরুৎসাহিত করে সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যৌক্তিক পর্যায়ে বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণকালীন পূর্ণ আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৬

অ) বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ কোন অর্থ বছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষা ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করার কথা বলা হয়?

ক. ২০১০-১১ খ. ২০১১-১২
গ. ২০১২-১৩ ঘ. ২০১৩-১৪

২। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী ২০১৮ সালের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত কত হবে?

ক. ১ : ৩০ খ. ১ : ৩৫
গ. ১ : ৪০ ঘ. ১ : ৪৫

৩। প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রম সি-ইন-এড-এর মেয়াদ বৃদ্ধি করে কত বছর মেয়াদী করার প্রস্তাব করা হয়েছে?

ক. ১ বছর খ. ১৮ মাস
গ. ২ বছর ঘ. ৩ বছর

সঠিক উত্তর: ক) ১। খ; ২। ক; ৩। খ।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর মূল ভিত্তি কী?
২. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা স্তর কোনটি?
৩. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর কোনটি?
৪. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের সকল পর্যায়ে কত নম্বর ও ক্রেডিট-এর ইংরেজি বিষয় সকল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ প্রাথমিক, বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পর্কে যে বিশেষ দিকগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তার বিবরণ দিন।
২. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ মাধ্যমিক এবং বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কিত সুপারিশগুলো উল্লেখপূর্বক এগুলোর কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করুন।
৩. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ উল্লেখিত উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করুন।
৪. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উপর একটি পর্যালোচনা প্রবন্ধ লিখুন।